তারকেশ্বর তথ্য।

বঙ্গের প্রসিদ্ধ প্রাচীন তীর্থ ৺ তারকেশ্বর ধামের
প্রাচীন আধুনিক নানা ঐতিহাসিক-
রহস্যপূর্ণ অভিনব ইতিহাস।

হিন্দু সখাপত্রের সম্পাদক, পুরুলিয়া ভিক্টোরিয়াস্কুল
বালি বিভার্স-টমসনস্কুল, কলিকাতা জুবিলিস্কুল প্রভৃতি বিদ্যালয়ের
ভূতপূর্ব্ব প্রধান সংস্কৃতাধ্যাপক

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাজকুমার বেদতীর্থ-স্মৃতিতীর্থ-কাব্যভূষণ

বিরচিত ও প্রকাশিত

১ম সংস্করণ।

কলিকাতা,
৩৮ নং শিবনারাণ দাসের লেনস্থ "ঘোষ-প্রেস" হইতে
শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

১৩১৬

মূল্য—॥৵০ আনা

পুস্তক প্রাপ্তির ঠিকানা— শ্রীশরৎকুমার ভট্টাচার্য্য। কৈকালা পোঃ (হুগলী

মুখবন্ধ।

আরামভূত—চিত্তবিশ্রামভূমি—বঙ্গের তারকেশ্বরধাম। কল গ্যাস ড্রেনের অস্তিত্ব না থাকিলেও; চব্যচোষ্যলেহ্যপেয়ের লীলাভূমি না হইলেও, বায়ু-বিনিন্দিতগতি তড়িৎযানের বিদ্যমানতা দেখা না যাইলেও, ইহা জনসমাগমে সদাপ্রমুদিত; যেহেতু এস্থানে কলির জাগ্রত দেবতা শিবশম্ভু তারকনাথ ব...স্ব-মহিমায় সর্ব্বদা বিরাজমান। তাই বলিয়াছি তীর্থবিশেষক—মধুর তারকেশ্বর।

...দিকে মাঠ; চৌদিকে—পল্লীভাব। চতুর্দ্দিকে নৈসর্গিক দৃশ্য। তবুও বলি ইহা জুড়াইবার স্থান। যেহেতু এখানে রোগী, ভোগী, যোগী, তাপী আসিয়া নিত্য নানা অভীষ্ট ফল লাভ করতঃ হাসিমুখে প্রস্থান করিতেছে; বল দেখি পাঠক?—ভারতের কোন তীর্থে এতটুকু মাহাত্ম্য দেদীপ্যমান আছে।—এই জন্যই তারকেশ্বরের গুরুত্ব এবং এই জন্যই ইহার নাম—দেশ-বিদেশবিশ্রুত।

আমি বহুদিন হইতে চেষ্টিত ছিলাম যে—তারকেশ্বরধামের একটী ইতিহাস লিখিব। মহামতি ক্রফোর্ড সাহেব, স্বর্গীয় গোবর্দ্ধন রক্ষিত প্রমুখ বিদ্বদ্‌বৃন্দ একার্য্যে কিছু কিছু হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু কাহারও কার্য্য সুন্দর ও নির্ভুল হয় নাই। সেইজন্যই আমার তারকেশ্বর সংক্রান্ত ইতিহাস লিখিবার এত সাধ। সে আশা আজ কতকটা ফলবতী হইল। এ গ্রন্থ রচনায় কাগজপত্রাদি সংগ্রহ করিতে আমাকে যেরূপ কষ্ট ও ব্যয়ভার বহন করিতে হইয়াছে; তাহার তুলনায় মূল্য যে ॥৵০ দশ আনা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তা কিছুই নহে।

তারকেশ্বর তথ্য সম্পূর্ণ নূতন গ্রন্থ। এরূপভাবের গবেষণাপূর্ণ পুস্তক এপর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। যদিও ইহা হিন্দুসখা মাসিক পত্রের সহিত প্রকাশিত হওয়ায়, স্থানে স্থানে কোন কোন বিষয়ের পুনরুল্লেখ হইয়াছে এবং সন্দর্ভবিশেষ যথাস্থানে সন্নিবেশিত হয় নাই; আর কোন কোনস্থলে কিছু কিছু ভ্রমপ্রমাদও রহিয়া গিয়াছে; তথাপি যে ইহা ঐতিহাসিক তথ্যজ্ঞাপনে যথোচিত সাহায্য করিবে তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। আশা আছে পরবর্ত্তী সংস্করণে এসকল অভাব অভিযোগ নিরাকৃত করিয়া ইহাকে অধিকতর সুন্দরভাবে লোকসমক্ষে উপস্থিত করিতে পারিব।

তারকেশ্বর-তথ্য রচনায়—তারকেশ্বর তীর্থসংসৃষ্ট যে সকল ব্যক্তির নিকট ... যাহা সাহায্য পাইবার আশা করিয়াছিলাম, কার্য্যতঃ তাহা পাই নাই। ...য় চকদিঘীর জমীদার শ্রীযুক্ত ললিত মোহন সিংহ রায় বাহাদুর, বৈদ্যপুরের ...ন্দ্র-বংশাবতংস শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী সেন প্রমুখ মহাশয়গণ যেরূপ সহানুভূতি দেখাইয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাদিগের নিকট চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম। এক্ষণে পাঠক-পাঠিকাগণ তারকেশ্বর-তথ্যের সমাদর করিলে সকল শ্রম সফল হইবে।

...কালা, হুগলী, শিবচতুর্দ্দশী (১৩১৬)   শ্রীরাজকুমার দেবশর্ম্মা।

তারকেশ্বর তথ্য।

অবতরণিকা।

কালের বিচিত্র লীলা! জগৎ—নিত্যপরিবর্ত্তনশীল। আজ যে ভূভাগ মনুষ্যগণের কলরবে নিরত মুখরিত এক সময়ে হয়ত তাহা মনুষ-বাসের অযোগ্য ছিল। আজ যে স্থান পশুপক্ষীর লীলা ভূমিতে পর্য্যবসিত একদিন হয়ত তাহা রম্য হর্ম্মে পরিমণ্ডিত ছিল। ইহাই প্রকৃতির নিয়ম,—ইহাই কালের স্বাধর্ম্ম্য। পরিবর্ত্তনশীল জগতে,—নশ্বর মর্ত্ত্যলোকে, একদৃষ্ঠ এক সামগ্রী চিরস্থায়ী হয় না। রামচন্দ্রের সেই অযোধ্যানগরী,—যুধিষ্ঠিরের সেই ইন্দ্রপ্রস্থ—রাজর্ষি জনকের সেই মিথিলানগরী এখন কোথায়? কোথায় এখন সেই—মনু, অত্রি, হারীত, বিষ্ণু, ব্যাস বাল্মীকি, ভবভূতি, কালীদাস? কালের দুর্জ্জেয় গহ্বরে সকলেই বিলীন হইয়া গিয়াছে।

এইত গেল নিষ্পত্তির কথা, উৎপত্তির বিষয় লইয়া আলোচনা করিলেও দেখা যায়—অতীত কালে যাহা ছিলনা তৎপরবর্ত্তী সময়ে তাদৃশ—অনেক বস্তুর আবির্ভাব হইয়াছে। দ্বারাবতী, মাহীষ্মতী, গিয়াছে সত্য; কিন্তু কলিকাতা বোম্বাই আবির্ভূত হইয়াছে। বিধাতার এ ইচ্ছা নয় যে নিয়ত অপচয়ই হইতে থাকুক, উপচয়ের সংঘটন নিষ্প্রয়োজন। যদি সে ইচ্ছা হইত তাহা হইলে শিক্ষায় দীক্ষায়, অর্থে্য সামর্থে, বীর্য্যে শৌর্য্যে, বিত্তে বুদ্ধিতে: লোক জগতের এত ক্রমোন্নতি পরিদৃষ্ট হইত না। প্রজাপতির যে বিধানে প্রকৃতি বৃদ্ধি পাইতেছে, প্রজোন্নতি সংঘটিত হইতেছে এবং লোক সাধারণের অশেষবিধ সুখসম্পত্তির আবির্ভাব হইতেছে, কেনা বলিবে যে, তাঁহার সেই বিধিবশেই—বনভূমি নগরে পরিণত হইতেছে এবং বঙ্গের প্রসিদ্ধ তীর্থ তারকেশ্বর ধাম এতাদৃশ অভ্যুন্নতির সীমায় পদার্পণ করিয়াছে।

পাঠকগণ বোধ হয় সুবিদিত আছেন যে তীর্থের নামোল্লিখিত হইল—তাহা বঙ্গ দেশের মধ্যে একটী সুবিখ্যাত জনপদ ও প্রাচীনতম তীর্থ স্থান; হুগলী জেলা ও শ্রীরামপুর মহকুমার এলেকায় এ তীর্থের অবস্থিতি। কলিকাতা হইতে ইহার দূরত্ব ন্যূনাধিক ১৮ ক্রোশ হইবে। ইষ্টইণ্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানির বাষ্পীয়-যান সহযোগে কয়েক ক্রোশ মাত্র অতিক্রম করিলেই সেওড়াফুলিষ্টেশনে উপস্থিত হওয়া যায়। এই ষ্টেশন হইতে তারকেশ্বর ব্র্যাঞ্চ-

রেলওয়ে বাহির হইয়াছে! বলা বাহুল্য তারকেশ্বর পর্য্যন্ত গিয়াই এ রেলরাস্তার অবসান হইয়াছে। হাওড়া ষ্টেশন হইতে তারকেশ্বর প্রায় পশ্চিম উত্তর কোণে অবস্থিত। শিবরাত্রি ও চৈত্রসংক্রান্তির সময় এই তীর্থে লক্ষ লক্ষ নরনারীর সমাগম হইয়াথাকে। *

তারকেশ্বরে দেবাদিদেব মহাদেবের শিলাময়ী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। তাহাই অনাদিলিঙ্গ বা অনাথলিঙ্গ নামে অভিহিত। লোকে সাক্ষাৎ শিবজ্ঞানে ইঁহার পূজার্চ্চনাদি করিয়াথাকে! জনসাধারণের নিকট এ শিবলিঙ্গের নানা নাম শ্রুত হওয়া যায়—যথা—তাড়েশ্বর, তারকেশ্বর টাড়েশ্বর ও তারকনাথ প্রভৃতি। তারকেশ্বর শিবের অগাধ সম্পত্তি, মোহান্ত তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্ররূপে সে টাকাকড়ি ও জমিদারীর রক্ষক। সুতরাং তিনি যোগী হইয়াও ভোগী।

যেরূপ কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে তাহা বিশ্বাস্য হইলে বলিতে হয় যে এ শিব শিলা সামান্য নহে, বহুশত বৎসর পূর্ব্বে এ মহীয়সী শিলার আবির্ভাব হইয়াছে। প্রবাদের উপর প্রত্যয় স্থাপন করিলে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে ইহা পাতালভেদি স্বয়মুৎপন্ন শিবাংশসম্ভূত মহাদেবাধিষ্ঠিত শিলাখণ্ড ভিন্ন আর কিছুই নহে।

কেমন করিয়া এ শিলাখণ্ডের আবির্ভাব হইল; কিরূপে এ মহাতর্থের আবিষ্কার হইল; ইহা জানিয়া রাখা বিশেষ আবশ্যক। আমরা ক্রমান্বয়ে সেই সমস্ত কথার মীমাংসা করিব।

এপর্য্যন্ত অনেক লেখক তারকেশ্বর সম্বন্ধীয় ইতিহাস লিখিতে স্বল্পাধিক পরিমাণে লেখনী চালনা করিয়াছেন কিন্তু কাহারও বর্ণনাই সম্পূর্ণ বা অভ্রান্ত হয় নাই!—সকলের সিদ্ধান্তেই কিছু না কিছু ত্রুটী আছে। ইহার কারণ আর কিছুই নহে তারকেশ্বরের ইতি বৃত্তমূলক কাগজ পত্র পাওয়া দুর্ঘট। একমাত্র তারকনাথের ছড়াই অনেকের ইতিহাস রচনার অন্যতম সহায়। নিরক্ষর কবির বিরচিত সে ছড়া কতদূর প্রামাণ্য ও অবলম্বনীয় পাঠপাঠিকাগণ তাহার বিচার করিবেন।

(*) চৈত্রমাসে শিবসন্ন্যাসের পদ্ধতি আছে। তদুপলক্ষে তারকেশ্বরে প্রায় সমস্ত চৈত্রমাস সন্ন্যাসীর ভিড় হয়। চৈত্রসংক্রান্তির দিন এই সকল সন্ন্যাসী গৃহীত উত্তরীয় (পাটা) উন্মোচন করিতে আইসে। তজ্জন্য এত যাত্রী সমাগম হয়। অন্যান্য পর্ব্বোপলক্ষেও বহুলোক এ তীর্থে আসিয়া থাকে। আচণ্ডাল ব্রাহ্মণের তারকেশ্বর শিবেরপূজার অধিকার আছে॥

আবিষ্কারকে—নানামত।

তারকেশ্বর তীর্থের আবিষ্কর্ত্তা লইয়া নানামত-দ্বন্দ্ব দৃষ্ট হয়। অনেকের মতে রাওভারামল্ল নামধেয় জনৈক ক্ষত্রিয় নরপতি তারকেশ্বর তীর্থের আবিষ্কারক ও তারকেশ্বরশিলার সংস্থাপক। অন্যপক্ষ বলেন তাহা নহে; ত্রিকুটস্বামী নামক কোন সন্ন্যাসীই তারকেশ্বর শিবের প্রতিষ্ঠাতা। তারকেশ্বরের মোহান্ত সতীশচন্দ্র গিরি মহাশয়ও এই শেষোক্ত সিদ্ধান্তের অনুকূলে ১৯০৮ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসের একখণ্ড ইংলিসম্যান সংবাদ পত্রে লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে তারকেশ্বর শিলা প্রথম মোহান্ত দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত হয়।

বিগত ১৩১৪ সালের একখণ্ড স্বদেশপত্রে * ত্রিকুটস্বামীকেই তারকেশ্বরের আবিষ্কারক বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। তাহাতে লিখিত হইয়াছে যে—"মহামতি শঙ্করাচর্য্যের প্রতিষ্ঠিত দশমঠের অন্তর্গত গিরি সম্প্রদায়ভুক্ত ত্রিকুট-গিরি নামে এক মহাতপস্বী সন্ন্যাসী একটী ক্ষুদ্র পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ করিয়া তাড়পুরের বনে (+) তপস্যা করিতেন, তিনি শিবোপাসক ছিলেন, তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত মহাদেব তাড়কেশ্বর নামে আখ্যাত হইতেন। ক্রমে তিনি তাড়কেশ্বর তারকেশ্বর তারকনাথ প্রভৃতি নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন কিন্তু মহাদেবের আদিনাম তাড়েশ্বর।

বর্দ্ধমান জেলার এলেকাভুক্ত চকদিঘী গ্রামের জমীদার রায় ললিতমোহন সিংহ মহাশয় রাজা ভারামল্লকেই তারকেশ্বর তীর্থের আবিষ্কারক বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, এবং ত্রিকুটস্বামীকে তাঁহার কুড়াইয়া পাওয়া ব্রাহ্মণ কুমার বলিয়া উল্লেখ করত অঙ্গীকার করিয়া গিয়াছেন যে—"রায় ভারামল্লের দেহান্তে ঐ ব্রাহ্মণকুমারই প্রথম মোহান্ত বা সেবাইতরূপে পরিগণিত হয়। সম্ভবতঃ তাঁহারই নাম ত্রিকুট গিরি।"

আমাদিগের নিকট ললিতবাবুর কথা একান্ত বিশ্বাস্য হইলেও তদীয় পত্রোদ্ধৃত "সম্ভবতঃ" কথাটীর উপর আমাদের সংশয় আছে। হইতে পারে রাও ভারামল্ল কোন ব্রাহ্মণকুমারকে কুড়াইয়া পাইয়াছিলেন কিন্তু তিনিই যে তারকেশ্বরের প্রথম মোহান্ত হয়েন এবং সেই ব্যক্তিই যে ত্রিকুটগিরি ইহার কোন অকাট্য প্রমাণ আছে কি?

---

* স্বদেশ পত্র (সাপ্তাহিক)—১৬ বৈশাখ—১৩১৪ সাল

(+) তারকেশ্বরের প্রাচীন নাম তাড়পুর ছিল।

আমরা কিন্তু তারকেশ্বরের মোহান্তের গদিতে ত্রিকুট গিরিকে প্রথমাধিষ্ঠিত না দেখিয়া জগন্নাথগিরি নামধেয় কোন উদাসীন সন্ন্যাসীকে প্রথমারূঢ় দেখিতে পাই। ১২৮৩ সালের প্রকাশিত "তারক মঙ্গল" নামক একখানি প্রামাণ্য পুস্তকেও তাহাই অঙ্গীকৃত হইয়াছে। যথা—

মুকুন্দ জানিল মনে শঙ্করের খেলা। জগন্নাথে ভোলানাথ করিলেন চেলা॥

* * * * * *

অতঃপর মোহান্তের শুন বিবরণ। শিবের আদেশ আছে করিতে সাধন॥
ইন্দ্রিয় সংযম করি জগন্নাথ গিরি। প্রতিদিন প্রাণায়াম সাধে ধিরি ধিরি॥

* * * * * *

বড়ই কঠিন সেই যোগ ভয়ঙ্কর। সিদ্ধ না হইতে ছাড়িলেন কলেবর॥
পূর্ব্বে করেছিলা গিরি চেলা দুই জন। ফতেগিরি আর এক কমললোচন॥

(তারক মঙ্গল।)

এই সকল প্রমাণ প্রয়োগ দর্শনে ত্রিকুটগিরিকে তারকেশ্বরের প্রথম মোহান্ত না বলিয়া "জগন্নাথ"কে প্রথম সেবাইত বলিয়া স্বীকার করিতে হয়।

পক্ষান্তরে তারকেশ্বরশিলাখানি পাতাল ভেদ করিয়া আবির্ভূত হইয়াছে এরূপ বাক্য কবি-কল্পনা বলিয়া মনে হয়। সে শিলার প্রথমাবিষ্কারক বা প্রাথমিক প্রতিষ্ঠাতা একজন অবশ্যই ছিল। রাওভারামল্ল তারকেশ্বর তীর্থের আবিষ্কর্ত্তা! তারকেশ্বর শিলার স্থাপয়িতা নহেন। সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে যে তৎপূর্ব্বে অন্য কাহারও দ্বারা উক্ত শিলাখণ্ডের প্রতিষ্ঠা ব্যাপার সমাহিত হইয়াছিল।

যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে প্রাগুক্ত স্বদেশপত্র ও মোহান্ত সতীশচন্দ্র গিরি মহাশয়ের সহিত একমত হইয়া বলিলে বোধ হয় দোষ হইবে না যে—তারকেশ্বর শিবলিঙ্গ প্রথম মোহান্ত (সম্ভবতঃ ত্রিকুটগিরি) কর্ত্তৃকই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল; মহাতপস্বীর স্থাপিত বলিয়া তাহার মহিমাও অলৌকিকরূপে আবহমান কাল বর্ত্তমান আছে। স্থাপনকর্ত্তা মোহান্তের দেহ লয়ের পর শিলাধিষ্ঠিত স্থানটী বন জঙ্গলে পরিপূর্ণ হইয়া যায়; মহারাজ ভারামল্ল সেই বন জঙ্গল উৎপাটিত করিয়া বর্ত্তমান শিবলিঙ্গের আবিষ্কার করিয়াছেন। এই হিসাবেই তাঁহার আবিষ্কর্তৃত্ব এবং এই নিমিত্তই তিনি এতাবৎ কাল বঙ্গের আবালবৃদ্ধবনিতার নিকট চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন।

তারকেশ্বরাবিষ্কারক রাজা ভারামল্ল

পূর্ব্বে রাও ভারামল্ল নামক জনৈক ক্ষত্রিয় নরপতিকে তারকেশ্বর তীর্থের আবিষ্কারক বলিয়া উল্লেখ করা গিয়াছে। যখন তারকেশ্বর তাড়পুর নামে অভিহিত হইত, যখন এ মহাতীর্থ মাত্র একটী দুর্গম বনজঙ্গলে পর্য্যবসিত ছিল,* ঠিক সেই সময় উক্ত ক্ষত্রিয় নরপতি বর্ত্তমান তারকেশ্বরের দক্ষিণ পশ্চিম কোণবর্ত্তী রামনগর গ্রামে রাজত্ব করিতেন। ইনিই তারকেশ্বর ধামের সকল শ্রীবৃদ্ধির মূল। ইহাঁরই সাহায্যে তারকেশ্বর শিবের প্রাচীন মন্দিরাদি নির্ম্মিত হয়। ইনিই ১০৫০ বিঘা জমী সংগ্রহপূর্ব্বক দান করিয়া শিবশম্ভু তারকনাথ বাবার সেবার সুব্যবস্থা করিয়া যান।

রাজা ভারামল্ল পরম শৈব ছিলেন। তিনি আজীবন বিবাহ করেন নাই বলিয়া শুনা যায়। হুগলীর ইতিহাসলেখক ক্রফোর্ড সাহেবও তাঁহাকে অকৃতদার বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। অন্য একজন চীন পরিব্রাজকের বর্ণনা হইতেও তাঁহাকে কুমার সন্ন্যাসী বলিয়া স্থির করা যায়। যাহা হউক ইহা অবিসংবাদিত বাক্য যে মহাত্মা ভারামল্ল চিরকাল শিব-সেবায়, শঙ্করার্চ্চনায়, দিনাতিপাত করিয়াছিলেন। পিতৃমাতৃ বিয়োগের পর তাঁহার বিষয়-স্পৃহা আরও শিথিল হইয়া যায়। সেই জন্য তিনি কখন স্বীয় প্রাসাদ রামনগরে থাকিতেন কখন বা কাশী চন্দ্রনাথ প্রভৃতি শঙ্করাধিষ্ঠিত স্থানসমূহে পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন।

বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুরের রাজাদিগের মল্ল উপাধি দৃষ্টে এবং তদনুসারে বিষ্ণুপুরকে "মল্ল ভূমি" বলে বলিয়া আর রাজা ভারামল্লের মল্ল উপাধি ছিল দেখিয়া অনেকে এই রাজপুত নরপতিকে বিষ্ণুপুর হইতে আগত বলিয়া মনে করেন। এরূপ মনে করিবার কারণও আছে। আজ পর্য্যন্ত তারকেশ্বরের মোহান্ত নিয়োগ-ব্যাপারে বিষ্ণুপুরের রাজবংশের অনুমতি লইতে হয় এবং বিষ্ণুপুর রাজসরকারে তারকেশ্বর সংক্রান্ত কাগজপত্রও এখন পর্য্যন্ত বর্ত্তমান আছে বলিয়া শুনা যায়। এই সকল কারণে তারকেশ্বরাবিষ্কারক ভারামল্লকে অনেকে বিষ্ণুপুর রাজবংশের

(*) তারকেশ্বরাবিষ্কারের পরও তথায় যথেষ্ট জঙ্গল ছিল। ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া নামক ইংরাজী মাসিকপত্রে এ কথা বহুদিন পূর্ব্বে অঙ্গীকৃত হইয়াছে।

সহিত সম্পৃক্ত বলিতে চাহেন, কিন্তু সে ধারণা সম্পূর্ণ অমূলক। আমরা জানি ভারামল্লের পিতা খাঁটী রাজপুত ছিলেন। তিনি অযোধ্যাপ্রদেশান্তর্গত কালিঞ্জর হইতে বাঙ্গালায় আসিয়া বাস করেন।

রাজপুতানার রাণাবংশ প্রকৃত সূর্য্যবংশ। মল্লবংশ তদপেক্ষা নিকৃষ্ট। রাজা তোড়র্মল এই মল্লবংশ-সম্ভূত। মল্ল শব্দের অপভ্রংশ মল, তাই তোড়র্মল্ল শব্দ তোড়র্মলে পরিণত হইয়াছে। রাজা ভারামল্লও এই মল্ল বংশীয় লোক ছিলেন, এইজন্য তাঁহাকেও এখন বাঙ্গালার অনেক জনপদের লোক "ভারামল" বলিয়া থাকে। রাও উপাধি দৃষ্টে কেহ কেহ ইহাঁকে রাণা বংশসম্ভূত বলিয়া মনে করেন,—কিন্তু তাহা ঠিক নহে, তদীয় ভ্রাতৃবংশীয় কোন ব্যক্তির পত্রে প্রকাশ—"এখানে (বঙ্গদেশে) আসিয়া ··ঘটনাবৈচিত্রে বিষ্ণুদাস রাজা ও ··· ভারামল্ল রাওরাইয়া উপাধি পাইয়াছিলেন।"

সুতরাং বুঝিতে পারা যাইতেছে রাও উপাধি তাঁহার বঙ্গদেশে লব্ধ; জন্মভূমি রাজপুতানা হইতে প্রাপ্ত নহে। মল্ল শব্দের অর্থ বীর, রাজপুতানায় যাহারা যুদ্ধাদি ব্যবসায় দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিত তাহারাই বোধ হয় মল্ল উপাধিতে বিভূষিত হইত। মহারাজ ভারামল্ল এইরূপ যোদ্ধৃবংশ সম্ভূত ছিলেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই। রাজধর্ম্ম রক্ষার্থে অস্ত্র ধারণ এক কথা; আর ভরণপোষণ নির্ব্বাহার্থে অসি-চালনা আর এক কথা। বোধ করি এই ইতর বিশেষের জন্যই রাজপুতানার মল্লবংশ সম্ভ্রান্ত রাণাবংশ হইতে মানসম্ভ্রমে কতকটা হীন।

রাও ভারামল্লের প্রকৃত নাম ভৈরব মল্ল। বাল্যকালে ইনি ভইরা নামে অভিহিত হইতেন। সেই ভৈরব বা ভইরা শব্দ রূপান্তরিত হইয়া ভারায় পরিণত হইয়াছে। তাঁহার আর দুই ভ্রাতা ছিলেন, মধ্যম বিষণদাস মল্ল; ৩য় বরদাপ্রসাদ মল্ল। এই বিষণদাস কালক্রমে বিষ্ণুদাস নামে প্রসিদ্ধ হয়েন। যাঁহারা ইহাঁদিগকে বিষ্ণুপুর রাজবংশ হইতে সমাগত বলিতে চাহেন তাঁহারা বিষম ভুল করিয়া থাকেন সন্দেহ নাই। কারণ আমরা জানি বহু দিন হইতে বিষ্ণুপুরীয় রাজগণ অপুত্রক। এই বংশের প্রাচীন রাজা গোপালসিংহও অপুত্রক ছিলেন। এই গোপালসিংহের সময়েই বঙ্গে বর্গীর হাঙ্গামা, সেই বর্গী দমনের জন্যই বিষ্ণুপুরের প্রসিদ্ধ কামান "দলমদন" বিনির্ম্মিত হয়। প্রবাদ যে গোপাল সিংহের পরম সহায় বিগ্রহ মদনমোহন দেবের চেষ্টায় স্বয়ং বিশ্বকর্ম্মা আসিয়া এই কামান প্রস্তুত করেন। অনেকের মতে "দলমদন" দুইটী কামানের

নাম। দল নামধেয় একটী আর মদন নামীয় আর একটী। কিন্তু আমাদের মনে হয় ঐ নামে একটী কামানই বিনির্ম্মিত হইয়াছিল। কারণ একাল পর্য্যন্ত বিষ্ণুপুরে একটী কামানের অব্যবহার্য্য মূর্ত্তি ভিন্ন দ্বিতীয় কামানাংশ পরিদৃষ্ট হয় নাই। দলমদন শব্দের সাধু নাম দলমর্দ্দন! দল শব্দে বর্গী সম্প্রদায় আর মর্দ্দন শব্দে পীড়ক, যে বর্গী সম্প্রদায়কে দলন করিতে সমর্থ তাহাই দলমদন শব্দ পদবাচ্য বলিয়া মনে হয়। এই হিসাবে একটী কামানেরই নাম দলমদন হওয়া সম্ভব। দুইটীর নহে।

সে যাহা হউক যে গোপালসিংহের সময় এই কামান প্রস্তুত হয় সেই গোপালসিংহ নিজেও পোষ্যপুত্র ছিলেন; তৎপরবর্ত্তী রাজগণও অপুত্রকতা-নিবন্ধন দত্তকরূপে গৃহীত হইয়া রাজত্ব করিয়া আসিতেছেন, সুতরাং সেই বংশ হইতে ভারামল্ল প্রভৃতি ভ্রাতৃত্রয় জ্ঞাতিবিরোধ নিবন্ধন বাহির হইয়া রাম-নগর প্রভৃতি জনপদে আসিয়া বাস করেন ইহা প্রমাদ বিজৃম্ভিত ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে। তবে ইহা আশ্চর্য্য নয় যে বিষ্ণুপুর রাজবংশের সহিত ভারামল্লের পূর্ব্বপুরুষগণের কোন সংস্রব ছিল।

কিরূপে মহারাজ ভারামল্ল জন্মভূমি ছাড়িয়া বঙ্গভূমিতে আসিয়া অধিষ্ঠিত হইলেম তৎসম্বন্ধে নানা দ্বৈধসিদ্ধান্ত শ্রুত হওয়া যায়। এক পক্ষ বলেন ইহাঁর পিতা কেশব হাজারী মুসলমানদিগের অত্যাচার হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য বঙ্গদেশে আসিয়া বাস করেন। অন্যপক্ষ বলেন তাহা নহে, তাঁহার বাঙ্গালায় আসিবার কারণ যুদ্ধবিগ্রহ।

দিল্লীর রাজসিংহাসনে যখন মোগল-কুলতিলক আকবরের বীর্য্যপ্রভা ধীরে ধীরে উদ্দীপ্ত হইতেছিল, মোগলগণ যখন পাঠান দমন করিয়া রাজত্ব সংরক্ষণের চেষ্টা পাইতেছিলেন, ঠিক সেই সময়ে প্রাগুক্ত কেশবমল্ল বাদশাহের সেনাপতিত্ব গ্রহণ করিয়া নানা স্থানীয় যুদ্ধবিগ্রহে জয়লাভ করত স্বকীয় বীর্য্যবহ্নির ক্রমো-দ্দীপন করিতে প্রবৃত্ত হয়েন, আকবর তাঁহার কার্য্যকলাপে ও বীর্য্য বাহুবলে পরিতুষ্ট হইয়া সহস্র সেনার অধিনায়কত্ব পদ প্রদান পূর্ব্বক তাঁহাকে হাজারী উপাধিতে বিভূষিত করেন।

জগৎ চিরকালই উপাধির দাস। যে কেশব মল্ল এত দিন উদয়পুরের রাণাবংশীয় নরপতিদিগের সেনাপতি থাকিয়া স্বজাতির সমৃদ্ধি বর্দ্ধনে বদ্ধপরিকর ছিলেন আজ সেই কেশবমল্লই বাদশাহ দত্ত উপাধি লাভ করিয়া ও চাকরীর

মোহিনী মূর্ত্তিতে কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞানহীন হইয়া স্বদেশীদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে লাগিলেন ! ধন্য পরাধীনতার সর্ব্বনাশিনী শক্তি !!

আকবর বড় বুদ্ধিমান নরপতি ছিলেন। তিনি দেশের লোক দিয়াই দেশীয় বিদ্রোহ প্রশমিত করিবার চেষ্টা পাইতেন। ফলে কৃতকার্য্যও বেশ হইতেন। পশ্চিম দেশীয় অনেকগুলি যুদ্ধ বিগ্রহে যখন তিনি কেশবমল্লের কৃতিত্বের পরিচয় বিশিষ্টরূপে সুপরিজ্ঞাত হইলেন, তখন তাঁহার তাঁহাকে আরও কঠিনতর কার্য্যে বিনিযুক্ত করিবার বাসনা হইল। ঠিক এই সময় বঙ্গদেশে পাঠান নরপতিগণ উদ্দাম প্রতাপে রাজত্ব করিতেছিল। তাহাদিগের অত্যাচারে বঙ্গদেশ অশান্তিময় হইয়া পড়িয়াছিল। আকবর এই সমস্ত নরপতিকে বশে আনিবার জন্য রাজপুত-গৌরব রাজা তোড়র্ম্মলকে সসৈন্যে বাঙ্গালায় প্রেরণ করিলেন আর সেই সঙ্গে কেশবমল্লকেও তাঁহার সহকারীরূপে পাঠাইয়া দিলেন। (*)

রাজা তোড়র্ম্মল ও বীরবর কেশবহাজারী নানা স্থানীয় যুদ্ধে জয়লাভ করিতে করিতে অবশেষে বাঙ্গালায় আসিয়া প্রবিষ্ট হইলেন এবং অজস্র যুদ্ধ বিগ্রহে পাঠান দলন করিতে লাগিলেন। পাঠানেরাও তাঁহাদিগকে বিধিমত প্রকারে ধ্বস্ত বিধ্বস্ত করিবার চেষ্টা পাইতে লাগিল ; এইরূপ উৎকট সঙ্ঘর্ষে কেশবহাজারী অত্যল্পমাত্র মোগল সৈন্য লইয়া বঙ্গের একটী ক্ষুদ্র জনপদের নিকট রাজা তোড়র্ম্মলের সান্নিধ্য হইতে পরিচ্যুত হইয়া পড়িলেন। পাঠানগণ তখন আত্মরক্ষার জন্য ব্যতিব্যস্ত না হইলে সেই ক্ষুদ্র জনপদেই কেশবহাজারীকে সসৈন্যে ভবলীলা সাঙ্গ করিতে হইত। যে জনপদের নিকট তিনি নিরাশ্রয় অবস্থায় পরিত্যক্ত হয়েন তাহার বর্ত্তমান নাম জঙ্গীপাড়া কৃষ্ণনগর, এই সঙ্গ-চ্যুতির কিছুকাল পরেই পাঠানগণ বশ্যতা স্বীকার করে এবং বঙ্গরাজ দায়ূদ খাঁ আকবরের শরণাপন্ন হয়েন, সুতরাং কেশবহাজারীকে পাঠানবিদ্রোহের কঠিন প্রায়শ্চিত্তও আর গ্রহণ করিতে হয় নাই। ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে আকবর পাঠান রাজগণের স্বাধীনতা হরণে সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন – সুতরাং

(*) কাহারও কাহারও মতে কেশবহাজারী মানসিংহের সহিত পাঠান দমনার্থ বাঙ্গালায় আসেন। তাহা হইলে তাঁহার বাঙ্গালায় আগমন অতীব আধুনিক হইয়া পড়ে. আমরা যখন মানসিংহের পূর্ব্ববর্ত্তী কালে ভারামল্ল কর্ত্তৃক তারকেশ্বরাবিষ্কারের সংবাদ পাইতেছি তখন স্মারকের পিতা তাঁহার বহুপূর্ব্বে এদেশে আসিয়াছিলেন ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য ॥

বুঝা যাইতেছে তাহার অনেক দিন পূর্ব্ব হইতেই পাঠানদিগের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান হইয়াছিল। কেশব প্রথমাভ্যুত্থানের সময়েই বাঙ্গালায় প্রেরিত হয়েন।

কবিবাক্যে আছে—"কো বীরস্ত মনস্বিনঃ স্ববিষয়ঃ কোবা বিদেশঃ স্মৃতঃ
যং দেশং শ্রয়তে তমেব কুরুতে বাহু-প্রতাপার্জ্জিতং।"

অর্থাৎ মনস্বী বীর ব্যক্তির স্বদেশ আর বিদেশ কি? + তিনি যে দেশ আশ্রয় করেন সেই দেশকেই বাহুবলে বশীকৃত করিয়া লয়েন।

কেশবহাজারীর পক্ষে এই মহাবাক্য বর্ণে বর্ণে সার্থক বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছিল। তিনি তোড়র্ম্মলের সঙ্গচ্যুত হইয়া বর্ত্তমান কৃষ্ণনগরের নিকটবর্ত্তী কোন স্থান অধিকার করিয়া পুত্রকলত্রাদি সহ পরম সুখে বসবাস করিতে লাগিলেন।

যাহারা তাঁহাকে অসহায় অবস্থায় সেই বিদেশ বিভূমে ফেলিয়া গিয়াছিল তাহাদের মুখাবলোকন করিতেও আর তাঁহার স্পৃহা রহিল না। তিনি স্বদেশের, স্বজাতির ও স্ববৃত্তির মুখে শতমুখী নিক্ষেপ পূর্ব্বক শান্তিপ্রিয় বঙ্গদেশের একটী ক্ষুদ্র জনপদে পরম সুখে বাস করিতে লাগিলেন। এই ভূভাগে অদ্যাপি তাঁহার মধ্যমপুত্রের বংশধরগণ বর্ত্তমান আছেন। এই স্থানকে বাহির গড় বলে। বাহিরগড় হুগলী জেলার দ্বারহাট্টা গ্রামের অদূরবর্ত্তী।

কেশব হাজারী প্রাপ্ত বয়স্ক পুত্রত্রয় লইয়াই এদেশে আসিয়াছিলেন। তাঁহার অন্তিমসময়ে সকলেই বিষয়কার্য্য পরিদর্শনে নিপুণ হইয়াছিলেন। এমন কি মধ্যম বিষ্ণদাস কিদ্দূরবর্ত্তী রামনগর গ্রামে একটী পৃথক বাসভবন প্রস্তুতও করিয়াছিলেন। এই বাসভূমির ভগ্নাবশেষ এখনও বর্ত্তমান আছে ইহাই রামনগরের গড় নামে আখ্যাত।

কেহ কেহ বলেন রামনগরের এই সৌধভবন ও গড় পরিখাদি ভারামল্লের খনিত, তাঁহার মধ্যম ভ্রাতা বিষ্ণুদাসের প্রস্তুত নহে। আমাদের বিশ্বাস অন্যরূপ। কারণ যে নৃপকুলতিলক সমূহ বিষয়বিরক্ত ছিলেন, যিনি আবহমানকাল বিবাহ করেন নাই,—তিনিই যে সুখে বাস করিবার জন্য সৌধভবন নির্ম্মাণ করাইবেন—ইহা কখন সম্ভবপর নহে! তবে যে পরবর্ত্তীকালে তাঁহাকে রামনগরের সর্ব্বেসর্ব্বারূপে দেখা গিয়াছিল তাহার কারণ বিষ্ণুদাস রামনগর ত্যাগ করিয়া পিত্রাধিকৃত ভুমি বর্ত্তমান বাহির গড়ে গিয়া বাস করিলে রামনগরের যাবত্তীয় বিষয় সম্পত্তি ও বাটী বাগিচা প্রভৃতি পর্য্যবেক্ষণের ভার তাঁহার অগ্রজের উপর পড়ে, কাজেই তখন হইতে তাঁহাকেই লোকে রামনগরের মহারাজা বলিয়া পূজা করিতে প্রবৃত্ত হয়।

রামনগর-বাসকালে বিষ্ণুদাস কতকগুলি মল্ল লইয়া একটী দল বাঁধিয়াছিলেন, এই জন্য বাঙ্গালার তাৎকালিক নবাব সরকারে তাঁহার চোরের সর্দ্দার বলিয়া কুখ্যাতি হয় এবং তজ্জন্য তিনি নবাবকর্ত্তৃক ধৃত হয়েন কিন্তু অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া অব্যাহতি লাভ করেন। একটী অগ্নিসন্তপ্ত লৌহদণ্ড তিনি স্বহস্তে ধারণ করিলে যখন তাঁহার হস্তদ্বয় পুড়িল না তখন নবাব চমৎকৃত হইয়া তাঁহাকে নির্দ্দোষ বলিয়া সদলবলে অব্যাহতি দিলেন। কেবল তাহাই নহে! ৫০০ বিঘা জমী জায়গীর পর্য্যন্ত দান করিলেন। বর্ত্তমান কৃষ্ণনগর ও তৎচতুঃপার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহে এই সকল জায়গীর প্রাপ্ত জমী বর্ত্তমান ছিল। অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর বিষ্ণুদাসের রাজা উপাধি হয় এবং তাঁহার অধিকৃত জনপদ বিষণ নগর বা বিষ্ণুনগর আখ্যা প্রাপ্ত হয়। কালক্রমে সেই বিষণ নগরই কৃষ্ণনগর আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। এই জায়গীর প্রাপ্তির পর হইতে বিষণদাসকে রামনগরে দেখা যাইত না। সুতরাং এই সময় হইতে রামনগরে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভারামল্লেরই একাধিপত্য হইয়া উঠে। রাজা বিষণদাসের দুই পত্নী ছিল, বলিয়া শুনা যায়। (‡)

মহারাজ ভারামল্ল কোন দায়ীত্বজনক কার্য্যে থাকিতেন না। যাহা করিতে হয় মধ্যম ভ্রাতাই করিতেন, রাজা উপাধি প্রাপ্তির পর বিষ্ণুদাস দেশীয় সকল রাজপুতের পরস্পর পঙ্‌ক্তি ভোজন পদ্ধতির প্রচলনের চেষ্টা পাইয়া "বার রাজপুত তের হাঁড়ি" কলঙ্ক দূরীকরণের প্রয়াস পান। জ্যেষ্ঠ ভারামল্ল তাহাতে অভিমতি প্রদান করেন। কনিষ্ঠ বরদা প্রসাদ মল্ল ইহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলে দেশীয় রাজপুত সম্প্রদায় ও অগ্রজদ্বয়ের সহিত তাঁহার বিবাদ হয়, সুতরাং তিনি তাঁহাদের সংস্রব ত্যাগ করিয়া সুপ্রসিদ্ধ গড় মান্দারণে গিয়া বাস করেন এবং একটী পৃথক রাজপুত সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করেন, অদ্যাবধি সেই সম্প্রদায়কে "বরদাই দল" বলে, হুগলী বাঁকুড়া বর্দ্ধমান ও মেদিনীপুরের বহুস্থানে এই সম্প্রদায়ের রাজপুত বর্ত্তমান আছে। বিষ্ণুদাস কৃত রাজপুত দল বালিগড়ী রাজপুত বলিয়া প্রসিদ্ধ! তাহারাও উক্তোক্ত জেলার

(*) রামনগরের যুগ্ম যুগ্ম পুষ্করিণী (ছোট দিঘী, বড় দিঘী জোড়া পুকুর) প্রভৃতি দেখিয়া অনেকে অনুমান করেন বিষণদাস একটী পুষ্করিণী খনন করাইয়া এক স্ত্রীর নামে প্রতিষ্ঠা করাইলে অপর স্ত্রী তাঁহাকে আর একটী সরোবর খনন করাইয়া স্বনামে প্রতিষ্ঠা করাইতে বাধ্য করিতেন।

অনেক স্থানে বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই উভয় সম্প্রদায়ে আদান প্রদান বা ভক্ষ্য ভোজ্য বহুদিন হইতে নিষিদ্ধ আছে।

বরদা প্রসাদ ঠিক গড় মান্দারণে গিয়া বাস করেন নাই। উহার নিকট-বর্ত্তী যেস্থানে তিনি বাস করিয়াছিলেন অদ্যাপি তাহা বরদা গড় নামে প্রসিদ্ধ! গড় মন্দারণ হুগলীর আরামবাগ মহকুমার এলেকাধীন! মহারাজ ভারামল্ল রাম-নগরের যে বাটীতে বাস করিতেন তাহা প্রসিদ্ধ জনার্দ্দন মিস্ত্রীর প্রস্তুত এবং তিনি তারকেশ্বর শিবের যে মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দেন তাহাও উক্ত মিস্ত্রীর বিনির্ম্মিত ছিল। জনার্দ্দনের প্রচলিত নাম "জুনারী"। জুনারীর হাতের অনেক সুপ্রাচীন দেবালয়াদি বাঙ্গলার বহুস্থানে বিদ্যমান আছে।

ভারামল্লের দ্বারা রাম নগরে অনেক সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান হইয়াছিল, অনেক বাগানবাগিচা দীঘি সরোবর দেবালয় পান্থশালা প্রস্তুত হইয়াছিল। কালের বিকট পরিবর্ত্তনে সকলই বিনষ্ট হইয়াছে। রাজ বাটীর সংলগ্ন দুইটী পুষ্করিণীর নাম (১) জলহরি। (২) পিতাম্বরা ছিল। এ দুটী এক্ষণে ভগ্নাবশিষ্ট। রাজবাটীর সংলগ্ন যে পরীখা খনিত হইয়াছিল তাহা এক্ষণে কৃষিক্ষেত্রও বনভূমিতে পরিণত, রাজার বাসভূমি ময়দান ও বন জঙ্গলে পর্য্যবসিত। রাজা ভারামল্ল তারকেশ্বর শিবলিঙ্গকে উঠাইয়া আনিবার অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু অসমর্থ হইয়া দুধের সাধ ঘোলে মিটাইবার প্রয়াস পান, রাজবাটীর ভিতর একটী শিবলিঙ্গ স্থাপনা করিয়া তাহাতেই পরিতৃপ্ত হয়েন।

রাজার প্রধান বাহুবল ছিল রাম ক্ষত্রিয় নামক জনৈক বীর পুরুষ! তাহার চেষ্টায় তিনি অনেক দুষ্ট দমনে, অনেক অশান্তি নিবারণে এবং অনেক বিদ্রোহ দলনে সমর্থ হয়েন। এই সময়ে রামনগরের নিকটবর্ত্তী দামোদর নদে এক শ্রেণীর জল দস্যুর উপদ্রব ছিল। ইহারা শ্বেতকায় বিদেশী বণিকবেশী বিজাতি। সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ইহাদিগের চুরি ডাকাতি করিতে দেখা যাইত না বটে কিন্তু ইহারা দেশীয় চোর ডাকাইত লুঠেরা ঠেঙ্গাড়ের নিকট হইতে অপহৃত দ্রব্যাদি অনবরত কিনিয়া লইয়া যাইত। ইহার ফলে দেশে চুরি ডাকাতির পরিসীমা ছিল না। মহারাজ ভারামল্ল এইরূপ একশ্রেণীর জলদস্যুকে রাম ক্ষত্রিয়ের সাহায্যে ধরিয়া আনিয়া বিষমদণ্ড প্রদান করিয়াছিলেন! ইহাই তাঁহার সৌভাগ্য জীবনের পট পরিবর্ত্তনের হেতু হইয়াছিল। উক্ত দণ্ডিত বণিক বৃন্দ স্বদেশে গিয়া এই সকল কথার উত্থাপন করে। ইহাদের পরবর্ত্তী কালে তাহা-

দিগের যে সমস্ত স্বদেশী লোক এদেশে বাণিজ্য করিতে আইসে তাহারা অগ্রে আসিয়া বর্দ্ধমানের তাৎকালিক মহারাজকে ভারামল্লের বিষয় সম্পত্তি হরণের জন্য- উত্তেজিত করে। ফলে ঘটিলও তাই, বর্দ্ধমানরাজ ইউরোপের বণিক সম্প্রদায়ের প্ররোচনায় একজন দেশীয় রাজার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন। উভয় পক্ষে তুমুল দাঙ্গাহাঙ্গামা বাধিল। ফলে ভারামল্ল ও তৎসহোদর বিষ্ণুদাস পরাজিত হইলেন। সুতরাং যাবতীয় বিষয় সম্পত্তি বর্দ্ধমান রাজসরকারে বাজেয়াপ্ত হইয়া গেল। কিন্তু এই ভাবটি চিরকাল ছিল না;— বর্ত্তমান তারকেশ্বরের নিকটে তৎকালে অনেক কায়স্থ জমীদার ছিলেন, তাঁহারা বর্দ্ধমান রাজ ফিরিৎ চাঁদ বাহাদুরকে জানাইলে তিনি তারকনাথ শিবের সম্পত্তি জোৎশম্ভূ উল্লেখে ৫৫০ বিঘা জমী ছাড়িয়া দেন। আর বিষ্ণুদাস নবাব সরকার হইতে যে জায়গীর পাইয়াছিলেন তাহা হইতে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রার্থনানুসারে ৫০০ বিঘা জমী তারকেশ্বর মহাদেবের সেবার ব্যয় নির্ব্বাহার্থে দান কবিয়াছিলেন,, এইরূপে তারকেশ্বর শিবের ১০৫০ বিঘা জমী দেবোত্তর সম্পত্তি হইয়াছিল। *

মহারাজ ভারামল্লের যে স্থানে সৌধভবন বিদ্যমান ছিল তাহার চৌহদ্দি (বর্ত্তমান) এইরূপ,—

পূর্ব্ব—রামক্ষেত্রার মাঠ। পশ্চিম—রামনগরের ব্রাহ্মণপাড়া।

উত্তর—গঙ্গাসাগর পুষ্করিণী ও দুলেপাড়া। দক্ষিণ—রামনগরের বাগ্দীপাড়া।

এই স্থানের প্রাচীন চৌহদ্দি অবশ্য অন্যরূপ ছিল। মহারাজ ভারামল্ল এই ভূভাগে বাস করিতেন এবং এই স্থানে বাস করিতে করিতেই তিনি অদূরবর্ত্তী তাড়পুরের (বর্ত্তমান তারকেশ্বরের) বনে যথেচ্ছ নিপতিত শিবশিলার সংবাদ স্বকীয় গোয়ালরক্ষক মুকুন্দ ঘোষের মুখে শ্রবণ করেন। কিরূপে সে সংবাদ তাঁহার নিকট উপস্থিত হয় কেনই বা উপস্থিত হয়, এবং উপস্থিত হইলেই বা তিনি কিরূপ দায়ীত্ব গ্রহণ করেন; এ সকল কথা পরে বিবৃত হইবে, এ অধ্যায়ে কেবল আবিষ্কারক ভারামল্লের জীবন বৃত্তান্ত সম্বন্ধে যথা কথঞ্চিৎ আলোচনা করা গেল।

---

* বিষণদাসের জাইগীর প্রাপ্ত জমীজাযগার কোনরূপ দলিল দস্তাবেজ না থাকায় দশশালা বন্দোবস্তের সময় উহা ইংরেজ সরকারে বাজেয়াপ্ত হইয়া যায়। সুতরাং সেই সঙ্গে বিষ্ণুদাস দত্ত ৫০০ বিঘা জমী ও কোম্পানি আত্মসাৎ করিয়াছেন। অবশিষ্ট ৫৫০ বিঘা জমী আছে! উহাই প্রকৃত প্রাচীন দেবোত্তর। বিষণদাসের বংশীয় কেহ কেহ বলেন ১০২৭ বিঘা মাত্র জমী তারকনাথ দেবের প্রাচীন দেবোত্তর ছিল। তাহা ঠিক নহে।

শিলাপ্রকাশ।

পূর্ব্বকালে গোধন ভারতবর্ষীয় লোকের প্রধান সম্পত্তি ছিল। গোসেবা প্রাচীনকালের লোকে পরম পুণ্য বলিয়া বিবেচনা করিত। পুরাণ সংহিতার যুগের ত কথাই নাই; তখন যাহার যত অধিক সংখ্যক গো থাকিত সেই তত অধিক ধনবান বলিয়া পরিগণিত হইত।

মহারাজ বিরাটের ৬০০০০ ষাটি হাজার গরু ছিল; রাজর্ষি জনকেরও অনেকগুলি গরু ছিল বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়। পুরাকালে গোপালনের ন্যায় গোদানও পরম পুণ্য বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইত। তাই শাস্ত্রে প্রায়শ্চিত্তাদির ব্যবস্থায় গোদানের পদ্ধতি বিহিত হইয়াছে। তাই শাস্ত্রকারগণ বলিয়া গিয়াছেন,—"গাবঃ স্বর্গস্য সোপানং গাবোধন্যাঃ সনাতনাঃ।"

কলির প্রারম্ভেও গোধন রক্ষণের প্রথা বেশ প্রবল ছিল, এখন যেমন নব্য-শিক্ষিতদিগের নিকট—বাবু পদবীধারী মহাত্মাদিগের সমীপে—গোসেবা নীচ-জনোচিত কার্য্য বলিয়া বিবেচিত হয়, গোগণের শকৃৎ মূত্রে তাঁহাদিগের মাথা ধরিয়া যায় পূর্ব্বে তেমন হইত না।

রামনগরনিবাসী তারকেশ্বরাবিষ্কর্ত্তা মহারাজ ভারামল্লের অনেকগুলি গরু ছিল। বলীবর্দ্দ অপেক্ষা তিনি গাভীর সংখ্যাই অধিক করিয়াছিলেন।

গোয়ালাই গোরক্ষণে সুনিপুণ বলিয়া মহারাজ বহুবিবেচনাপূর্ব্বক মুকুন্দ ঘোষ নামক জনৈক অভিজ্ঞ গোয়ালাকে গোয়াল পর্য্যবেক্ষণের ভার অর্পণ করিয়াছিলেন। মুকুন্দ সকল গোপালকের উপর কর্ত্তৃত্ব করিত। তাহার তত্ত্বাবধানে গোবৎসগণ উপযুক্ত সেবা শুশ্রূষা পাইয়া যথেষ্ট হৃষ্টপুষ্ট হইয়াছিল এবং অধিকাংশ গাভী প্রচুর পরিমাণে দুগ্ধ দান করিত। মুকুন্দের নিবাস ছিল —সাহপুর গ্রামে। সাহপুর (সাঁ পুর) বর্ত্তমান তারকেশ্বরের অদূরে পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত।

মুকুন্দ যদিও রাজার অধীনে চাকরী করিত তথাপি সে জাতিবৃত্তি ত্যাগ করে নাই। এখন যেমন চাকরী পাইলে লোকে জাতীয় বৃত্তির প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করিয়া থাকে, আলোচ্য সময়ে সেরূপ করিত না। রাজার অনুগ্রহে মুকুন্দের অভাব কিছু ছিল না—সংসার বেশ সুখস্বচ্ছন্দে চলিয়া যাইত; তথাপি সে জাতীয়

বৃত্তি গোপালন পরিত্যাগ করে নাই, বিস্তর গো-বলীবর্দ্দ তাহার গোয়ালভবন আলোকিত করিয়া থাকিত।

মুকুন্দের একটী গাভী ছিল তাহার নাম "ভারতী, ভারতীর দুগ্ধ অতি সুস্বাদু ছিল ও অধিক পরিমাণে হইত। রাজা ভারামল্লের বাটীতে তাহার দুগ্ধ অতি সুস্বাদু বলিয়া বিশেষ সমাদরে পরিগৃহীত হইত। অতি অল্প কাল ভারতীর দুগ্ধ হইত না। লোকে বলে কৃষ্ণকায় গাভীর দুগ্ধ অতি মিষ্ট হইয়া থাকে। ভারতীর দুগ্ধ পান করিলে সে প্রবাদ বর্ণে বর্ণে সত্য বলিয়াই প্রতীয়মান হইত।

কয়েক মাস গর্ভধারণের পর ভারতী প্রসূত হইল, বিংশতি দিবস তাহার দুগ্ধ দোহন করা হইল না। একবিংশতি দিবসে বৎস বান্ধিয়া রাখা হইল, উদ্দেশ্য যে আজ নবপ্রসূতির দুগ্ধ প্রথম দোহন করিয়া দেবতা ব্রাহ্মণকে দেওয়া হইবে ও রাজভবনে প্রেরণ করা হইবে।

বাছুর বান্ধিয়া ভারতীকে রাখালবালকের তত্ত্বাবধানে ছাড়িয়া দেওয়া হইল, যথাসময়ে সে প্রত্যাগমন করিলে মুকুন্দ নিজেই ভাণ্ড লইয়া দুগ্ধ দোহন করিতে বসিল। কিন্তু কি বিপত্তি? ভারতীর বাঁট হইতে অত্যল্প ও দুগ্ধ বাহির হইল না, যে অল্পমাত্র দুগ্ধ ছিল বৎসই তাহা খাইয়া ফেলিয়াছিল।

যে গাভী অন্যান্য বারে প্রসব করিয়াবধি অত্যধিক পরিমাণে দুগ্ধ দিয়া আসিয়াছে—আজ সে "ভাঁড়ে বাঁটে" করিতে দিল না, ভাবনার কথা বৈ কি? মুকুন্দের 'আভার' ভাবনা হইল, কেন এমন হইল—কিসে এরূপ ঘটিল—এরূপ দুগ্ধবতী গাভী কি জন্য দুগ্ধ প্রদানে কাতর হইল—ইত্যাকার শত শত চিন্তায় মুকুন্দের চিত্ত উদ্বেলিত হইতে লাগিল, কিন্তু করিবে কি?—উপায় নাই। গোপনন্দন বহুচিন্তার পর সিদ্ধান্ত করিল, ভাল ভারতী একদিন দুগ্ধ দেয় নাই—প্রত্যহ কখন এরূপ করিতে পারিবে না; কল্য দেখা যাইবে দুগ্ধ হয় কিনা?

এইরূপে সে দিন গত হইল। কিন্তু হায় তাহার পর দিনও সেই ভাব। সে দিনও ভারতী দুগ্ধদানে কাতরতা প্রদর্শন করিল। এইরূপে একদিন, দুই দিন, তিন দিন, চারি দিন, পাঁচ দিন অতীত হইল, তথাপি গাভীর দুগ্ধ হইল না। রাজা প্রতিদিন ভারতীর দুগ্ধের জন্য অপেক্ষা করেন কিন্তু শেষে সংবাদ যায় তাহার দুগ্ধ হয় নাই।

মুকুন্দ বড় লজ্জিত হইতে লাগিল। কখন রাজা তাহার মিথ্যাবাদীত্বের

পবিচয় পান নাই, আজ কিনা একটা গাভীর দৌরাত্ম্যে তাহাকে অবিশ্বাসী শঠের শ্রেণীভুক্ত হইতে হইল। গোপনন্দনের মনস্তাপেরঅবধি রহিল না।

৭।৮ দিনের পর মুকুন্দ পরিজনবর্গের প্রতি আদেশ করিল—আর ভারতীকে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে না। সে অনবরত গোয়ালে থাকিয়া "জাব" খাইতে থাকুক দেখা যাউক—তাহার দুগ্ধ হয় কি না।

বাটীর কর্ত্তার আদেশ অমান্য করিবার নহে। গোপগণ তাহাই করিল। পরদিন প্রভাতে যথাসময়ে দুগ্ধদোহনের ব্যবস্থা হইল, কিন্তু আজও সেই ভাব। এইবার মুকুন্দের অন্যান্য গোপালক ভৃত্যগণের উপর সন্দেহ হইল, ভাবিল—ইহারাই লুক্কায়িত ভাবে গরুটার দুধ দুহিয়া লইয়া গোপনে বিক্রয় করিতেছে; তাই তাহার দুগ্ধ হইতেছে না। ভাল, চোর ধরিতে হইবে।

বার (১২) দিনের পর মুকুন্দ এইরূপ স্থির নিশ্চয় করিয়া রাত্রিযোগে একাকী গোয়াল মধ্যে লুকাইয়া রহিল। সঙ্গে একগাছি বেশ মোটা রকমের খেঁটে লাঠীও রাখিল। বোধ হয়, উদ্দেশ্য ছিল যেমন দুগ্ধচোর গোয়ালঘরে প্রবেশ করিবে অমনি লগুড়দণ্ড-সহযোগে তাহার প্রাথমিক অভ্যর্থনা সম্পন্ন করা হইবে। তাহার পর রাজার নিকট নালিশ ও রাজদণ্ডের ব্যবস্থা।

এইরূপ বাসনায় বক্ষ বাঁধিয়া, গোপনন্দন সমস্ত রাত্রি একাকী অনিদ্রায় গোয়ালঘরে যাপন করিতে লাগিল। কিন্তু তাহার অভিলষিত চোর আর গোয়ালে প্রবেশ করিল না। রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, মুকুন্দ ঘুমের ঘোরে ঝিমাইতেছে; এমন সময় দেখা গেল—অকস্মাৎ ভারতীর বন্ধনরজ্জু খুলিয়া গিয়াছে এবং সে আপন ইচ্ছায় দ্রুতবেগে গোয়াল হইতে বাহির হইয়া যাইতেছে। মুকুন্দ তাহাকে ধরিতে চেষ্টা করিল; কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। গাভী দ্রুতবেগে একমনে একদিকে চলিতে লাগিল; মুকুন্দ অনন্যোপায় হইয়া অগত্যা তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল।

অল্পক্ষণের মধ্যে গাভী এক দুরবগাহ্য অরণ্যে গিয়া হাজির। সে বন রাম-নগরের শেষ সীমার পূর্ব্ব উত্তরাংশে অবস্থিত। রাজবাটী হইতে ব্যবধান প্রায় ২ মাইল হইবে। মুকুন্দের বাটী হইতে দূরত্ব অর্দ্ধ মাইলও হইবে না। তদীয় বাসভূমি সাহপুর হইতে ইহা সম্পূর্ণ পূর্ব্বাংশে স্থিত।

গাভীকে অরণ্যে প্রবেশ করিতে দেখিয়া মুকুন্দ ভাবিল—বোধ হয় এই স্থানে ভাল তৃণগুল্ম আছে; বাঁধা পড়িয়া দুঃশীলা তাহা খাইতে পায় নাই;

আজ হঠাৎ বন্ধনরজ্জু খুলিয়া যাওয়ায় একমনে এই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে।" ভাল দেখা যাউক্ দুঃশীলা কি করে? এইরূপ ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া মুকুন্দ গাভীকে অনেক গালিগালাজ করিল। কিন্তু তাহার সে ভর্ৎসনায় হইবে কি? তাহার সে ধারণা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

অনতিবিলম্বে মুকুন্দ দেখিয়া চমৎকৃত হইল যে, ভারতী বনের এক স্থানে গিয়া দণ্ডায়মান হইয়াছে; আর তাহার দুগ্ধাধার পালান হইতে অজস্রধারে দুগ্ধক্ষরণ হইতেছে *। এই অলৌকিক ব্যাপার অবলোকন করিয়া গোপনন্দন একেবারে বিস্ময়রসে পরিপ্লুত হইয়া গেল। ক্ষণকাল মধ্যে দেখা গেল গাভী দুগ্ধদান কার্য্য সমাপ্ত করিয়া গৃহাভিমুখে চলিতে আরম্ভ করিয়াছে।

এবার আর মুকুন্দ গাভীর পশ্চাদনুসরণ করিল না। যে স্থানে সে দুগ্ধদান করিয়াছিল, বনজঙ্গল ঠেলিয়া বহুকষ্টে সেই স্থানে গিয়া উপস্থিত হইল এবং দেখিতে পাইল—একখানি মৃৎ-প্রোপিত প্রস্তরখণ্ড সেই স্থানে নিপতিত রহিয়াছে, তাহার উপরদেশে একটী গর্ত্ত, শিলাখানি অনেকটা শিবলিঙ্গের মত। ভারতী তাহার উপরেই দুগ্ধদান করিয়া গিয়াছে।

---

* যে গাভীর ভাগ্যবত্তার প্রভাবে তারকেশ্বর শিবের প্রথম প্রকাশ, অনেকের মতে তাহা রাজা ভারামল্লের ছিল, মুকুন্দঘোষের নহে। একখানি প্রামাণ্য গ্রন্থেও ইহার অনুকূলমত লিপিবদ্ধ দেখা যায়, সে গ্রন্থের নাম "তারকমঙ্গল।"

তারকেশ্বরের ইতিহাসমূলক ছড়ায়—উক্ত গাভী মুকুন্দঘোষের বলিয়া উল্লিখিত আছে—

"মুকুন্দঘোষের ঘরে কপিলা গাই ছিল।
দিনে দিনে সে কপিলার দুগ্ধ কমি হ'ল॥" ইত্যাদি।

স্বর্গীয় দুর্গাচরণ রক্ষিত মহাশয়ের মতও তাই ছিল। তৎকৃত তাম্বুলবণিক নামক "গ্রন্থে" লিখিত আছে—"তারকেশ্বরের মন্দির যে স্থানে অবস্থিত তাহা পুরাকালে টাউড় নামক কণ্টক গাছসমূহে পরিপূর্ণ ছিল। ঐস্থান রামনগর নামে খ্যাত হইত। মুকুন্দঘোষ নামক গোপ জাতীয় এক ব্যক্তির গাভী ঐ বনে চরিত, দুগ্ধবতী গাভীগর্ণ গৃহে আসিয়া দুগ্ধ না দেওয়ায় ইহার কারণ অনুসন্ধান দ্বারা জানা গিয়াছিল—ঐ বন মধ্যস্থিত একটী শিলাখণ্ডে গাভীগণ দুধ দিত সুতরাং গৃহে তাহাদের দুগ্ধ থাকিত না"—

একজন চীন পরিব্রাজকের গ্রন্থেও ইহার অনুকূলমত লিপীবদ্ধ আছে বলিরা শুনিরাছি। হুগলীর ইতিহাস লেখক ডাক্তার ক্রফোর্ড সাহেব উক্ত গাভীকে মুকুন্দঘোষের বলিয়া স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। তারকেশ্বরের অদূরবর্ত্তী চকদিঘীর জমিদার রাজা ললিতমোহন সিংহ মহাশয়েরও তাহাই মত।

এইবার মুকুন্দের সকল সংশয় বিদূরিত হইল, সে যে এতদিন গোপালক-গণের উপর অযথা দোষারোপ করিয়া আসিয়াছে তজ্জন্য আপনাকে বারংবার ধিক্কার দিতে লাগিল এবং বেশ বুঝিতে পারিল যে, যে শিলায় ভারতী দুগ্ধদান করিয়া গিয়াছে তাহা সামান্য শিলা নহে—নিশ্চয়ই কোন দেবতা তাহাতে অধিষ্ঠিত আছেন।

সুতরাং গোপনন্দনের ভক্তির উদ্রেক হইল। সে বারংবার সেই শিলাখণ্ডকে প্রণাম প্রদক্ষিণাদি করিল। কেন জানিনা, আকার দেখিয়া মুকুন্দের আপনা হইতে শিলাখানিকে শিবশম্ভু বলিয়া বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হইয়াছিল। সুতরাং সে আশা মিটাইয়া, প্রাণ ভরিয়া, স্তবস্তুতি না করিয়া থাকিতে পারিল না। বিশ্বাস মানুষকে সব করাইতে পারে!

শিব-মুকুন্দে কথোপকথন।

অতঃপর "শিব-মুকুন্দে কথোপকথন" রূপ একটী অলৌকিক কিম্বদন্তীর প্রচার আছে। পাঠক পাঠিকাগণ বিশ্বাস করিতে হয় করিবেন, না করিতে হয় না করিবেন। আমরা কিন্তু প্রবাদমত ইতিবৃত্ত লিখিয়া যাইব, কারণ কিম্বদন্তীই আমাদিগের ইতিহাস সৃষ্টির অন্যতম উপকরণ। ভারতবর্ষ ইতিহাস গঠনে বড় অকৃতকর্ম্মা। ভারতে এমন ঘটনা অনেক বর্ত্তমান—যাহাদিগের প্রকৃত ইতিহাস এ পর্য্যন্ত বিরচিত হয় নাই। মহারাজ নন্দকুমার, নবাব সিরাজউদ্দৌলা—ইতিহাসলেখকদিগের কৃপায় এক একটী নিরবচ্ছিন্ন নরপশুর অবতার বলিয়া পরিবর্ণিত হইয়াছেন। অসম্ভব কথা যে তাঁহারা একেবারে অনন্ত দোষের আধার ছিলেন।

তাই বলিতেছি, ভারতের কোন দেশের, কোন স্থানের, কোন জাতির, কোন ব্যক্তির, কোন ঘটনার প্রকৃত নিরপেক্ষ ইতিহাস বিরচিত হয় নাই। কোথাও ঐতিহাসিকদিগের বিদ্বেষের বশে, কোথাও বা তাঁহাদিগের অনভিজ্ঞতার দোষে প্রকৃত ঘটনা বিকৃতভাবে জনসাধারণের সমক্ষে প্রতিভাত হইয়াছে। ঐ সকলের প্রকৃত তথ্য অবগত হইতে অনেকাংশে প্রচলিত কিম্বদন্তীর উপর নির্ভর করিতে হইবে; নচেৎ গত্যন্তর নাই। বলা বাহুল্য তাই আমরা তারকেশ্বরের পুরাতত্ত্ব-সংক্রান্ত-ব্যাপারে অনেক স্থলে চলিত প্রবাদের সহায়তা গ্রহণ করি-

য়াছি। শিব-মুকুন্দের কথোপকথন সংক্রান্ত ব্যাপারে তাহা আরও বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে।

গাভীকৃত অলৌকিক ব্যাপার পর্য্যবেক্ষণ করিয়া যখন মুকুন্দ শিলা-সমীপে দাঁড়াইয়া স্তুতিবন্দনাদি করিতেছিল; স্বকৃত অপরাধের ক্ষমা চাহিতেছিল এবং বারংবার প্রার্থনা করিতেছিল—"শিলায় যে দেবতা অধিষ্ঠিত থাকুন তিনি আসিয়া তাহার সহিত কথোপকথন করুন;" তখন বাস্তবিকই সে কি এক আধ্যাত্মিকভাবে বিমুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল। যাহা হউক তাহার বাসনাপূর্ণ হইতে অধিক বিলম্ব হইল না, অল্পক্ষণ মধ্যে সে দেখিতে পাইল—অঙ্গে ভস্মমাখা ললাটে চন্দ্রলেখা পরিধানে বাঘাম্বর—আসন বৃষের উপর, হস্তে ডমরুশিঙ্গা ত্রিশূল, সঙ্গে ভূতপ্রেত-প্রেতিনীকুল এতাদৃশ একব্যক্তি নরাকারে তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া কথোপকথন আরম্ভ করিলেন।

অভ্যাগতকে দেখিয়া মুকুন্দের ভয়ও হইয়াছিল—ভক্তিও জন্মিয়াছিল,। যাহা হউক সে তখন নীরব-নিস্পন্দ নিস্তব্ধভাবে আগন্তুকের বাক্যাবলী শ্রবণ করিতে লাগিল।—সে বচনাবলী এই—

বৎস! দিব্যজ্ঞানের প্রভাবে বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছ—আমি কে? তুমি পূর্ব্বজন্মে যথেষ্ট পুণ্যসঞ্চয় করিয়াছ তাই চর্ম্মচক্ষে আমার এ মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করিলে। তোমা হইতে আমার অভিনব পূজাপদ্ধতি মর্ত্তধামে প্রচারিত হইবে। মদধিষ্ঠিত বনপ্রোথিত এই শিলাখণ্ডের সংবাদ তোমার দ্বারাই লোকে অবগত হইতে পারিবে। স্মরণ রাখিও রোগ-শোকগ্রস্ত ভক্তলোকের মনোবেদনা বিদূরিত করিবার জন্যই আমার মর্ত্তধামে আগমন। যতদিন এ ভূভাগে এ শিলাখণ্ড বর্ত্তমান থাকিবে ততদিন আমার দৃষ্টি এ তীর্থধামে পূর্ণ মূর্ত্তিতে বিরাজ করিবে।

লুপ্তপ্রায় শিবধর্ম্মের সুপ্রচারের জন্য আমার আবির্ভাব! তুমি মদীয় সেবায় বিনিযুক্ত হইয়া কালক্ষেপ করিবে। এই যে প্রস্তরলিঙ্গ প্রত্যক্ষ করিতেছ—প্রতিদিন সাক্ষাৎ শিবজ্ঞানে ইহার সেবারাধনা করিবে। তোমার কপিলা গাভীর উপাদেয় দুগ্ধ আনিয়া প্রতিদিন এ শিলায় ঢালিয়া দিবে। তাহা হইলে তুমি ঐহিক পারত্রিক উভয়বিধ সদ্গতি লাভ করিবে—আর তোমায় জঠরযাতনা সহ্য করিতে হইবে না, তুমি শিবলোকে গিয়া শিবপুরীর দ্বারপাল হইয়া থাকিবে। তোমার দেহবিলয়ের পর এই শিলাখণ্ডের ঈশানকোণে ত্বদীয়

পূজার ব্যবস্থা হইবে। কিন্তু বৎস এ সকল নিগূঢ়তত্ত্ব কাহারও নিকট প্রকাশ করিও না, রাজা ভারামল্লের নিকট গাভী-সংক্রান্ত বৃত্তান্ত মাত্র জ্ঞাপন করিবে।

এইরূপ শিবমুকুন্দে আরও অনেক কথোপকথন হইল. ধর্ম্মাধর্ম্মের কথা—কালমাহাত্ম্যের কথা—আচার ব্যবহারের কথা প্রভৃতি অনেক বিষয়ের আলোচনা হইল। মুকুন্দও সুযোগ বুঝিয়া অনেক কথা জানিয়া লইল—অনেক অভীষ্ট সিদ্ধির বর মাগিল. পরম কারুণিক শঙ্কর তাহার বাসনা পূর্ণ হইবে বলিয়া সহসা কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গেলেন। মুকুন্দ তখন বড়ই দুঃখিত হইল। এতক্ষণ যেন সে দিব্যালোকে ছিল, এক্ষণে আবার দারুণ অন্ধকারে নিপতিত হইল। ফণী মাণিক হারাইলে, জননী সন্তান হারাইলে—অর্থগৃধ্নু ধনরাশি খোয়াইলে, বিলাসী বিলাসসুখে বঞ্চিত হইলে, যত না মনোদুঃখ অনুভব করে, মুকুন্দ ততোধিক দুঃখে দুঃখিত হইল। কিন্তু করিবে কি ?

কাজেই তখন সেই দুঃখাভিসন্তপ্ত গোপনন্দন ভাবিতে ভাবিতে স্বস্থানাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে তাহার ভাবান্তর উপস্থিত। দৈবপ্রভাবেই হউক আর মহামায়ার বশীকরণ তন্ত্রেই হউক—মুকুন্দ ক্রমেই শঙ্করের সহিত আলাপ. ভ্রান্তি বলিয়া বিবেচনা করিতে লাগিল। মনে করিল এ সকল চিন্তার বিকৃতিমাত্র। অন্ধজ্ঞানের কি দারুণ অত্যাচার! মোহবিহ্বলতার কি দারুণ প্রতাপ!

মুকুন্দ অনতিবিলম্বে স্বীয় ভবনে গিয়া উপস্থিত হইল। গিয়া অগ্রে দেখিতে যাইল পলায়িত গাভী গোয়ালে আসিয়া পহুছিয়াছে কি না?—গাভী তখন পরমানন্দে গোয়ালে দাঁড়াইয়া 'জাব' খাইতেছিল। মুকুন্দ দেখিয়া অনেকটা নিশ্চিন্ত হইল।

ইতঃপূর্ব্বে প্রভাত হইয়া গিয়াছিল। তরুণ অরুণের হৈমকান্তি অল্পে অল্পে উগ্রমুর্ত্তি ধরিবার প্রয়াস পাইতেছিল, তৃণাগ্রের তুহিনরাজি ক্রমশঃ বিশুষ্ক হইয়া আসিতেছিল। এতাদৃশ সময়ে মুকুন্দ নিকটবর্ত্তী বনপ্রান্ত হইতে স্বভবনে আসিয়া উপস্থিত হইল। এখন তাহার বদনমণ্ডলে গুরুগম্ভীরভাব বিরাজিত; যেন কি এক গাঢ় চিন্তায় সে নিমগ্ন। বাটীর সকলে ভাবিল সমস্ত রাত্রি গোয়ালে চৌকী দিয়াছে। অনিদ্রায় অনশনে বোধ হয় লোকটার এইরূপ ভাবান্তর পরিলক্ষিত হইতেছে। মুকুন্দ কিন্তু কাহারও নিকট তাহার প্রকৃত কারণ ব্যক্ত করিল না।

রাজার শিবলিঙ্গদর্শন।

স্বীয় ত্রুটীর নির্দ্দোষতা প্রমাণের অনুকূল কারণ সংগ্রহ করিতে পারিলে কে না আহ্লাদিত হয়? মুকুন্দ এতদিন রামনগরে স্বকীয় কপিলা গাভীর দুগ্ধ প্রেরণ করিতে পারে নাই, তজ্জন্য বিশেষ কুণ্ঠিত ছিল, আজ তাহার সে ত্রুটীর কারণ প্রদর্শণের অবসর উপস্থিত হইল সুতরাং মানসিক সন্তুষ্টির উদ্রেক না হইবে কেন? মুকুন্দ এইরূপ স্থির করিয়া রহিল যে কল্যই গিয়া রাজার নিকট তাবৎ বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিবে।

এইরূপে সমস্ত দিবস গত হইল, ধরণী রজনী-সমাগমে ধূসরবাসে সমাবৃত হইলেন; দিনকর ডুবিল, চন্দ্র দেখা দিল। মুকুন্দ শিলা-সংক্রান্ত ঘটনা ভাবিতে ভাবিতে নৈশ-শয়নে শায়িত হইল। নিদ্রাযোগে একটী অদ্ভুত স্বপ্ন তাহার মানসক্ষেত্রে ক্ষণ কালের জন্য ক্রীড়া করিয়া লইল, কে যেন তাহার শিরোদেশে আসিয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে বলিয়া দিয়া যাইল—"বনমধ্যে যে শিলাখণ্ড তুই দেখিয়া আসিয়াছিস্ তাহা সাক্ষাৎ শঙ্করাধিষ্ঠিত শিবলিঙ্গ হইলেও তোর রাখালগণের অত্যাচারে তাহা ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে; অনভিজ্ঞ গোচারকগণ ক্ষেত্র-নিপতিত ধান্যাদি সংগ্রহ করিয়া ঐ শিলাখণ্ডের উপর পেষণ করত চাউল বাহির করিয়া থাকে। তজ্জন্য শিলাখণ্ডের উপর একটী মহাবিল হইয়াছে। অজ্ঞতার দোষে ও ক্ষুন্নিবৃত্তির বশে এ ব্যাপারের প্রাত্যহিক অনুষ্ঠান না হইলে এতদিন সকলকে সমুচিত প্রতিফল ভোগ করিতে হইত। অনবরত দ্বাদশ বৎসরকাল পরম কারু-ণিক মহাদেব এ অত্যাচার সহ্য করিয়া আসিতেছেন, কিন্তু আর নহে!!" এই অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিয়া মুকুন্দের তৎক্ষণাৎ নিদ্রাভঙ্গ হইল এবং ক্ষণকালের জন্য সে একটী দিব্য অস্ত্রশস্ত্র-ভূষিতা বহুবাহু-সমন্বিতা স্ত্রীমূর্ত্তি দেখিয়া ভীত চকিত ও বিস্মিত হইল; মুকুন্দ যেন কিছু বলিবার জন্য শয্যা ত্যাগ করিতে যাইতেছিল; কিন্তু স্ত্রীমূর্ত্তি কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গেলেন, আর কিছু বলা হইল না।

দেখিতে দেখিতে অল্পক্ষণ মধ্যে প্রাভাতিক কিরণে জগৎ আলোকিত হইয়া উঠিল। মুকুন্দ প্রাতঃকালেই রামনগরে গমন করিতে বিরত হইল না। আজ দুই তিনদিন সে রাজবাটীতে আসে নাই। সকলেই জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল "অনাগমনের কারণ কি?" মুকুন্দ কাহারও নিকট প্রকৃত হেতু প্রকাশ করিল না।

সমস্ত দিবস গোয়াল-পর্য্যবেক্ষণের কার্য্য সমাপন করিয়া, মুকুন্দ শিলা সংক্রান্ত ঘটনা ব্যক্ত করিবার জন্য অপরাহ্নে রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিবার প্রয়াস পাইল। সে জানিত রাজ-পূজার অনুষ্ঠানকারী সদানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় নৃপতির বড় প্রিয় পাত্র। অতএব অগ্রে সে তাঁহার নিকট গিয়া উপস্থিত হইল।

সদানন্দ এই সময় স্বীয় বাসাঘরে খট্টায় শয়ন করিয়া বিশ্রাম সুখ অনুভব করিতেছিলেন। মুকুন্দ যথাযোগ্য প্রণামাদি করিয়া ব্রাহ্মণের সমক্ষে গিয়া দণ্ডায়মান হইলে তিনি গুরু গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি? ঘোষের পো যে! আবশ্যক কি?"

মুকুন্দ উত্তর করিল—"আজ্ঞে! যে বিষয় নিবেদন করিবার জন্য আসিয়াছি তাহা একটু গোপনে হইলেই বলিবার সুবিধা হয়।" সদানন্দ মুকুন্দের প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন। কিয়দ্দূরে যাইবার পর উভয়ের কথোপকথন আরম্ভ হইল।

গোপনন্দন ব্রাহ্মণের শক্তিমত্তা ও গুণ বর্ণনা করিয়া প্রার্থনা করিলেন— "মহারাজ ভারামল্লের সহিত একবার সাক্ষাৎ করাইয়া দিতে হইবে।" যদিও নরপতি মুকুন্দকে বিশেষ স্নেহ করিতেন তথাপি তাঁহার সহিত তাহার দেখা করিবার সুযোগ প্রায় ঘটিত না। মুকুন্দ আচার ব্যবহারের দ্বারাই বুঝিয়া লইত—রামনগররাজ তাহাকে কথঞ্চিৎ অনুগ্রহের চক্ষে দেখিয়া থাকেন।

যাহা হউক মুকুন্দের প্রার্থনা শুনিয়া সদানন্দ তাহাতে কিঞ্চিৎ অবজ্ঞা প্রকাশ পূর্ব্বক উপহাসের ভাবে বলিলেন—তুমি গোয়ালা জাতি, গোরক্ষণে মজবুত, তোমার আবার রাজার সহিত কথা কিসের? মুকুন্দ উগ্রমস্তিষ্কের লোক ছিলনা; তাহা হইলে এইখানেই ব্রাহ্মণের সহিত তাহার এক তরফা হইয়া যাইত। সে জানিত—"স্বকার্য্যমুদ্ধরেৎ প্রাজ্ঞঃ—"

সুতরাং মুকুন্দ একটু ব্যাজস্তুতি সহকারে তখন উত্তর করিল, "মহাশয় ক্ষুদ্র নদী মহানদীর সমাগম পাইলে কি সাগর সঙ্গমে যাইতে বিরত থাকে!' আমি জাতিতে গোয়ালা সত্য, কিন্তু প্রয়োজনানুসারে কি চণ্ডালেও নৃপ সাক্ষাৎকারলাভের অধিকারী হয় না?

সদানন্দ এইবার একটু বিভিন্ন ভাবাপন্ন হইলেন, স্বকীয় স্তুতিবাদে বোধ হয় একটু আনন্দ ও জন্মিল। যে গোপজাতির অশীতি বর্ষ বয়স না হইলে জ্ঞানযোগ হয় না বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস ছিল সেই গোয়ালার মুখে অলঙ্কার পূর্ণ গুণানুবাদ! সদানন্দের বিভিন্ন ভাবাক্রান্ত হইবার কথাইত।

মুকুন্দ তদীয় মানসিক-অবস্থা পরিবর্ত্তনের ভাব বেশ বুঝিতে পারিল, তখন আবার সে দ্বিগুণ তোষামোদ সহকারে বলিতে আরম্ভ করিল—প্রভু! অধীন ভালরূপে অবগত আছে যে মহারাজ আপনাকে বিশেষ ভক্তি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস করিয়া থাকেন। যদি সাক্ষাতের সুযোগ হয় তাহা হইলে আপনার সাহায্যই হইবে বলিয়া আমার ধারণা! একটা অনুরোধ—কিসের জন্য দেখা করিতে হইতেছে এখন তাহা শুনিবার ইচ্ছা করিবেন না। আর আমার মুখেই বা শুনিবার দরকার কি? মহারাজের সহিত আপনার যেরূপ ঘনিষ্ঠতা তাহাতে তিনি আপনাকে তাহা না বলিয়া থাকিতে পারিবেন না।

"হাঁ তাত বটেই"—বলিয়া সদানন্দ মুকুন্দের শেষোক্তির সমর্থন করিলেন। মানাভিমানীর গৌরবকথা লোকমুখে প্রকাশ পাইলে তাহা তাহার বড় প্রীতিপদ হইয়া থাকে। সুতরাং সদানন্দ আর অধিক বাক্যব্যয় না করিয়া কহিলেন—ভাল এখন তুমি স্বস্থানে প্রস্থান কর, তোমার প্রস্তাব সন্ধ্যার সময় গিয়া রাজার নিকট উপস্থাপিত করিব, তিনি যাহা বলেন, অদ্যই তুমি জানিতে পারিবে।

দেখিতে দেখিতে দিবা অবসান প্রায় হইয়া আসিল, পশ্চিম গগন প্রায়োহস্তমিত ভানুর তাম্ররাগে রঞ্জিত হইয়া উঠিল। বিহঙ্গমগণ আহারান্বেষণে বিরত হইয়া বসতি বৃক্ষের দিকে অগ্রসর হইল, গোপালকগণ গোপাল লইয়া মাঠ হইতে জনপদাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। সকলেই বুঝিল সন্ধ্যা সমাগত প্রায়, তাই প্রকৃতি দেবী কষায় বস্ত্র পরিধান করিয়া চির সহচরীর প্রণয়-সম্ভাষণের জন্য প্রস্তুত হইতেছে।

সদানন্দ আর কালবিলম্ব না করিয়া স্বকার্য্য পালনার্থ রাজার পূজা-মন্দিরে গিয়া উপস্থিত হইলেন ও আরাধ্য দেব দেবীর সায়মর্চ্চনার আয়োজনে মনোনিবেশ করিলেন। দেখিতে২ কৃষ্ণবসনা সন্ধ্যা আসিয়া জগৎ জুড়িয়া বসিল। পূজামন্দিরে মঙ্গলারতির বাদ্য বাজিয়া উঠিল। বলা বাহুল্য রাজা অন্যান্যদিনের মত অদ্যও সান্ধ্যোপাসনা সমাপন করিলেন। সকল কার্য্য সমাপ্ত হইলে সদানন্দ সুবিধা বুঝিয়া রাজার নিকট মুকুন্দঘোষ সংক্রান্ত আবৎ বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিলেন, এবং তাহার সাক্ষাৎ করিবার প্রার্থনাও জানাইলেন!—রাজা সকল কথা শুনিয়া "পরদিন প্রভাতে উদ্যান ভ্রমণ কালে মুকুন্দের সহিত সাক্ষাৎ হইবে

বলিয়া" স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। বলা বাহুল্য সদানন্দ আসিয়া তৎক্ষণাৎ সে সংবাদ মুকুন্দকে জানাইয়াছিলেন॥

রজনী প্রভাত হইয়াছে—পূর্ব্বাকাশে সহস্রাংশুর কিরণমালা বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে—কৃষক হল-গোপাল লইয়া মাঠে চলিয়াছে—রাখাল গরুর পাল লইয়া প্রান্তরে যাইবার উদ্যোগ করিতেছে—সমীরণ মৃদু মন্দ প্রবাহে প্রবাহিত হইতেছে—পুষ্পোদ্যানে নানা জাতীয় কুসুম বিকসিত হইয়া বিশ্বস্রষ্টার অনন্ত মহিমার প্রচার করিতেছে।

এতাদৃশ সময়ে মহারাজ ভারামল্ল প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া রাজবাটী সংলগ্ন প্রমোদবনে চলিলেন। হস্তে তাঁহার ফুলের সাজী। উদ্দেশ্য অন্যান্য দিনের ন্যায় আজও তিনি স্বহস্তে কুসুম তুলিয়া আনিয়া শঙ্করার্চ্চনা করিবেন। রাজা প্রমোদ্যানের তোরণ দ্বার দিয়া প্রবেশ করিতে যাইতেছেন এমন সময় দেখিলেন অদূরে তাঁহার গোয়াল রক্ষক মুকুন্দঘোষ দণ্ডায়মান। প্রভুর চক্ষু ভৃত্যের উপর নিপতিত হইলে যাদৃশ সম্মানপ্রদর্শন করা উচিত; গোপতনয় মুকুন্দ তাহার ত্রুটী করিল না।

সে প্রণতিনম্র-মস্তক হইয়া দণ্ডায়মান হইলে মহারাজ ভারামল্ল বলিতে লাগিলেন—তোমার সাক্ষাৎ করণের প্রার্থনা আমি কল্যই সদানন্দের মুখে অবগত হইয়াছি; এবং অদ্য এই স্থানে আসিলে সাক্ষাৎ হইবে বলিয়াদিয়াছি। বোধ করি সেই জন্যই তুমি এখানে আসিয়া থাকিবে। জিজ্ঞাসা করি তোমার এবং আমার গোবলীবর্দ্দগণের সর্ব্বাঙ্গীণ কুশল ত?

মুকুন্দ রাজার বাক্য শ্রবণ করিয়া স্বীয় তত্ত্বাবধানে স্থিত গো সকলের কুশল জ্ঞাপন পূর্ব্বক বলিতে লাগিল—মহারাজ সে বিষয়ে আপনার চিন্তিত হইবার কোন কারণ নাই। অদ্য নরপতির সাক্ষাৎলাভের উদ্দেশ্য—আমার নিজ বাটীর একটী গাভীর অলৌকিক কার্য্যাবলী জ্ঞাপন করা। এই গাভীর নাম ভারতী। মহারাজের সেবায় ইহার দুগ্ধ বহুবার প্রেরিত হইয়াছে এবং নরনাথও তাহা বিশিষ্ট সুস্বাদু বলিয়া বিশেষ প্রীতিসহকারে সেবন করিয়া থাকেন। এবার প্রসূত হওয়ার পর হইতে ভারতী দুগ্ধদানে বড়ই কাতরতা দেখাইতেছে, এজন্য প্রথম প্রথম আমি রাখালগণের উপর অবিশ্বাস করিয়াছিলাম। ধারণা হইয়াছিল তাহারা গোপনে দুগ্ধ দোহন করিয়া ভক্ষণ করিয়া থাকে; অথবা চুরি করিয়া বিক্রয় করে, কিন্তু অবশেষে গোপনে থাকিয়া

দুগ্ধ হ্রাসের কারণ যাহা আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি তাহাতে সে ভ্রম ধারণা আমার বিদূরিত হইয়াছে এবং বেশ বুঝিয়াছি যে আমার ভারতী সামান্য গাভী নহে। সাক্ষাৎ কপিলার অবতার।

আজ প্রায় দুইমাস হইল ভারতী সন্তান প্রসব করিয়াছে। একবিংশতি দিবসের পর তাহার বাছুরকে গোয়ালে আবদ্ধ করিয়া রাখা হয়। রজনী প্রভাত হইবামাত্র বৎস লইয়া অতি সত্বর গাভীর নিকট যাইলাম। নূতন গাভীর নূতন দুগ্ধ নূতন পাত্রে দোহন করিয়া দেবতা ব্রাহ্মণকে দিয়া অবশিষ্টাংশ মহারাজের সেবার জন্য প্রেরণ করিবার বাসনা ছিল। কিন্তু কি দুর্দ্দৈব! সামান্যমাত্র দুগ্ধ ও বাঁট হইতে বিনিঃসৃত হইল না। একদিন নহে—দুইদিন নহে—অনবরত ১২ দিন কাল এইরূপ হইতে লাগিল, আমি সন্দিহান হইয়া কখন গোপালক গো-চাকরগণের উপর অবিশ্বাস করিয়াছিলাম কখন বা কোন দুষ্ট-মন্ত্রবিৎ গাভীর 'মন্দ' করিয়াছে বলিয়া স্থির নিশ্চয় করিয়াছিলাম।

এই পর্য্যন্ত বলিয়া মুকুন্দ ক্ষণকালের জন্য নীরবতা অবলম্বন করিল, তাহার চক্ষুদিয়া কয়েক ফোঁটা প্রেমাশ্রু পড়িয়া গেল, মহারাজ ভারামল্ল তাহার নীববতা ভঙ্গের জন্য—দ্বিগুণ শ্রবণেচ্ছা দেখাইয়া কহিলেন—বল তাহার পর কি ঘটিয়াছিল। এবং কেমন করিয়াই বা তুমি স্বীয় গাভীকে কপিলা বলিয়া স্থির নিশ্চয় করিয়াছ।

রাজার অনুরোধে মুকুন্দ তুষ্ণীম্ভাব পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় গাভীর দুগ্ধ-হ্রাসের কারণ যাহা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছিল সে গুলি (১৪ পৃষ্ঠা হইতে ১৮ পৃষ্ঠোক্ত) আমূলান্ত বর্ণনা করিল। রাজা শুনিয়া বিস্ময়রসে পরিপ্লুত হইয়া গেলেন। ভাবিলেন মুকুন্দ সাধারণ লোক নহে—তাহার কপিলাও সামান্য নহে। মুকুন্দ পরদিন প্রত্যূষে স্বীয় গাভীর কার্য্যাবলী রাজার প্রত্যক্ষ করাইতে পারে বলিয়া প্রকাশ করিল। রাজাও তাহাতে স্বীকৃত হইয়া সেই উদ্যানে অতি প্রত্যূষে তাহাকে উপস্থিত হইতে বলিলেন। মুকুন্দ ও তাহাতে স্বীকৃত হইয়া প্রস্থান করিল।

প্রস্থানের পর উভয়কে উভয়ের কর্ত্তব্য পালনে ব্যাপৃত হইতে হইল! মহারাজ পূজার্চ্চনাদি করিয়া রাজকার্য্য নির্ব্বাহার্থে রাজসভায় গিয়া বসিলেন। মুকুন্দ রাজার গোয়ালবাটীর তত্ত্বাবধানে সমস্ত দিন অতিবাহিত করিল। সন্ধ্যার পর সে স্বীয় নিবাস সাহাপুরে গমন করিল। ক্রমে যত রজনী

গাঢ় হইতে গাঢ়তরা হইয়া আসিতে লাগিল, মুকুন্দের মনের চিন্তার স্রোতও ততই গাঢ় হইতে গাঢ়তর ভাব অবলম্বন করিতে থাকিল। তাহার বিষম চিন্তা হইয়াছে যদি রাজাকে পূর্ব্বকথিত ভারতী সংক্রান্ত ঘটনা প্রত্যক্ষ করা-ইতে না পারে তাহা হইলে রাজা তাহাকে অবিশ্বাস করিবেন।

দেখিতে দেখিতে রজনী অবসান হইয়া আসিল, সুধাংশু আকাশ মণ্ড-লের এক প্রান্তে গিয়া পড়িলেন, শৃগাল পেচক শেষ ডাক ডাকিয়া বিচেয়-তারকা রজনীর নীরবতা ভঙ্গ করিয়া দিল। সরোবর-বাসিনী কুমুদিনীর মলিন মুখ ও আসন্ন পুলকে প্রমোদিনী পুলকিতা কমলিনীর প্রফুল্ল মুখে নব বিবাহিতা বধূর ব্রীড়া বিদমিত হাসির ন্যায় সরস হাস্য প্রত্যক্ষ করিয়া সকলেই বুঝিল রজনী শেষ হইয়াছে। অনতিবিলম্বে পদ্মিনী পতি সমাগমে সগর্ব্বা হইয়া উঠিবে।—তাই তাহার এত হাব ভাব ও এত আত্মম্ভরীতা।

এতাদৃশ সময়ে মুকুন্দ শিব শিব শব্দে শয্যাত্যাগ করিয়া কর্ম্মস্থান রামনগরের দিকে যাত্রা করিল। রাজাও আজ কিছুপূর্ব্বে উদ্যান ভ্রমণে বহির্গত হইয়াছিলেন। সুতরাং মুকুন্দ প্রাগুক্ত বাগিচায় গিয়া হাজির হইবার অল্পক্ষণ পরেই নৃপ-সাক্ষাৎকারলাভে সমর্থ হইল। দেখা হইবামাত্র মুকুন্দ রাজাকে স্বীয় ভবনের দিকে লইয়া যাইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিল। রাজা তাহাতে বাধা দিয়া বলিলেন—আপাততঃ তাহা করিতে হইবে না, চল এক্ষণে সেই শিলাধিষ্ঠিত অরণ্যে গিয়া গোপনে অবস্থান করি; তাহা হইলে আর গাভী কৃত কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিবার কোন বাধা ঘটিবে না।

সাধুভৃত্য স্বীয় স্বামীর কথায় কখন অসম্মতি প্রকাশ করে না। সুতরাং মুকুন্দ নৃপতির প্রস্তাবেই প্রস্তুত হইল ও তাঁহাকে সমভিব্যাহারে লইয়া সেই শিলাধিষ্ঠিত অরণ্যে গিয়া উপস্থিত হইল। তাঁহাদিগের উপস্থিতির অল্পক্ষণ পরেই দেখা গেল; গলদেশে অল্প সংলগ্ন রজ্জু একটা গাভী হঠাৎ সেই বনে প্রবেশ করিল। তখন ইতস্ততঃ কথোপকথন তৎপর উভয়ের চক্ষুই তাহার উপর নিপতিত হইল। মুকুন্দ তখন গাভীটাকে দেখাইয়া বলিল—মহারাজ ঐ আমার সেই কপিলা। দেখুন এখন উনি কি করেন। তাহার পর—

"গোপনে থাকিয়া রাজা দেখিলা নয়নে।
অপরূপ দেখি হৈলা আনন্দিত মনে॥

দুগ্ধ দিয়া ফিরে ঘরে ভারতী চলিল।
লিঙ্গের নিকটে দোঁহে আসিয়া দেখিল ॥
রাজা বলে শুন গোপ তুমি পুণ্যবান।
তোমা হইতে ভবার্ণবে পাই যদি ত্রাণ ॥
এই লিঙ্গ উঠাইয়া গড়ের ভিতর।
ল'য়ে যাব ঘরে বসি পূজিব শঙ্কর ॥" (উদ্ধৃত)

অতঃপর উভয়ে শিবলিঙ্গের যথাযোগ্য স্তব বন্দনাদি করিলেন। রাজা শিলাখণ্ডের শিরোদেশে হাত দিয়া ও দেখিলেন—যে বাস্তবিক তাহার উপর হস্ত প্রমাণ গর্ত্ত জন্মিয়াছে। মুকুন্দের মুখে তিনি শুনিয়াছিলেন—রাখাল বালকগণ ধান্য পেষণ করায় এই মহাগর্ত্ত জন্মিয়াছে। সুতরাং মহারাজ প্রাণে বড় ব্যথা অনুভব করিলেন। ভাবিলেন—হতভাগ্য আমি তাই আমার অজ্ঞাত সারে দয়াময় শঙ্করের লিঙ্গের উপর এইরূপ অত্যাচার ক্রমাগত হইয়া আসিয়াছে। যাহা হউক ভারামল্ল প্রস্তর খানিকে একটু নাড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু সুমেরু পর্ব্বতের ন্যায় অচল অটলভাব দেখিয়া কেমন করিয়া তাহা স্বীয় ভবনে লইয়া গিয়া প্রতিষ্ঠিত করিবেন তজ্জন্য একটু চিন্তিত হইলেন। অতঃপর উভয়ে "যদভাবি ন তদ্ভাবি ভাবিচেন্ন তদন্যথা"(†) বাক্যের যাথার্থ্যের উপর নির্ভর করিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। *

† সংস্কৃত শ্লোকার্দ্ধের অর্থ=যাহা ঘটিবার তাহার অন্যথা হইবে না, যাহা ঘটিবার নহে তাহা ঘটিবে না।

* কেহ কেহ বলেন—মুকুন্দ কথিত গাভী সংক্রান্ত বৃত্তান্তের যাথার্থ্য উপলব্ধি করিবার জন্য মহারাজ ভারামল্ল প্রথমে কপিলাধিপতি মুকুন্দের গোয়ালঘরে অবস্থান করিয়াছিলেন। তাঁহার পর গাভীর পশ্চাদনুসরণ করিয়া প্রাগুক্ত শিলাধিষ্ঠিত অরণ্যে উপস্থিত হইয়াছিলেন। কিন্তু তারক নাথের ছড়া হইতে ইহার কিছু প্রমাণ পাওয়া যায় না। যথা—

কাননে শিবের লিঙ্গ শুনিয়া শ্রবণে।
যান ভারামল্ল রাজা শম্ভু দরশনে ॥ (ছড়া)

ছড়ার এই উক্তিই যথার্থ। তবে রাজা যে একেবারে সৈন্য সামন্ত লইয়া শিবশিলা দর্শনার্থ গিয়াছিলেন—ইহা আমরা বিশ্বাস করিতে পারি না। অগ্রে তিনি মুকুন্দের সঙ্গে কাননে গিয়া কপিলার অলৌকিক কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আসিয়াছিলেন,—তাহার পর সৈন্য সামন্ত লইয়া শিব দর্শনার্থ গিয়াছিলেন। ছড়ায় সেই (২য় বারের) যাত্রাই লিখিত হইয়াছে।

"রাহুত মাহুত ঘোড়া সাজিল লস্কর।
যাত্রা কৈল ভারামল্ল বনের ভিতর ॥"

রাজার শির লিঙ্গোৎপাটন চেষ্টা।

ধরায় ঋতুপতি বসন্তের আবির্ভাব হইয়াছে। ফুলহার-শোভিতা অবনী সুন্দরী এখন স্বামী সোহাগিনী কামিনীর ন্যায় মানগর্ব্বে গর্ব্বিতা—বেশ ভূষায় ভূষিতা—স্নিগ্ধ মন্দ সুগন্ধ সমীরণে বীজিতা এবং নাতি শীতোষ্ণ সুখ দুঃখদা।

এই বসন্তকালের একদিন সহসা রামনগরের রাজবাটীতে জয়ডঙ্কা বাজিয়া উঠিল। শঙ্খবীণা বংশী মর্দ্দলাদির ঘনরোলে দিগ্‌বিদিক্ মুখরিত হইয়া উঠিল। সকলেই বুঝিল আজ মহারাজের পূর্ব্ব ঘোষিত প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইবে। রাম নগরের গড়ে আজ নূতন শিব-স্থাপনা, কানন ভূমি হইতে আজ শিবশম্ভু মহাদেবের পাতাল ভেদী লিঙ্গ আনীত হইবে। সুতরাং দলে দলে রাগনগরের রাজ বাটীতে লোকসমাগম হইতে লাগিল। কেহ ভক্তিপরতন্ত্র হইয়া কেহ রহস্য-দর্শনেচ্ছা করিয়া কেহ বা বনোৎপাটনাদি পূর্ব্বক শিব-শিলোদ্ধারার্থ পরিশ্রম দান করিবে বলিয়া, রাজনগরীতে সমাগত হইতে লাগিল।

এদিকে মুকুন্দ ঘোষ যথাবিধানে ত্রিসন্ধ্যা শিব শিলার আরাধনা আরম্ভ করিয়াছিল, ক্ষণকালের জন্য সে দেবাদিদেব মহাদেবের আজ্ঞা বিস্মৃত হয় নাই। গন্ধ পুষ্পদিয়া দুগ্ধ ঢালিয়া নৈবেদ্যাদি করিয়া যথাশক্ত্যুপচারে গোপ-তনয় শিব লিঙ্গের পূজার্চ্চনা করিয়া আসিতেছিল। সুতরাং বুঝিতে পারা যাইতেছে সেই দুর্গম অরণ্য কথঞ্চিৎ লোক সমাগমের আধার হইয়াছিল। রাজার উদ্যমে কিন্তু মুকুন্দ সন্তুষ্ট নহে। যেদিন হইতে সে শুনিয়াছে মহারাজ ভারামল্ল শিবশিলাখানিকে বনভূমি হইতে স্থানান্তরিত করিবেন সেই দিন হইতে তাহার কি যেন একটা মনোবেদনার আবির্ভাব হইয়াছে। অথচ স্পষ্টতঃ কিছু বলিতে পারে নাই, মনিব চাকর সম্পর্ক, রাজা প্রজা সম্পর্ক পালক পালিত সম্বন্ধ, এরূপ স্থলে কিছু বলাও সমীচীন নহে।

যাহা হউক যথাকালে মহারাজা পাত্রমিত্র পুরোহিত-সমভিব্যাহারে শিলা-আনয়নার্থ রাজা প্রাসাদ হইতে বাহির হইলেন। বহুবিধ পূজোপহার বাহকেরা সঙ্গে সঙ্গে লইয়া চলিল। ইক্ষু, চিনি, তালশাঁস, ফুটি আতপ তণ্ডুল, রম্ভা আর দুগ্ধ গঙ্গাজল ভারে ভারে যাইতে লাগিল। দুগ্ধ, গোয়ালা দত্ত না হইলে পাছে শঙ্করের সন্তোষ না জন্মে এই আশঙ্কায় কয়েকজন গোয়া-লিনী সঙ্গে সঙ্গে দুগ্ধপূর্ণ ভাণ্ড কক্ষে লইয়া চলিল। রামনগরের প্রতিদ্বারে পূর্ণকুম্ভ ও কদলী স্তম্ভ মঙ্গল-দ্যোতনার্থ রক্ষিত হইল। বহুসংখ্যক খনক ঝুড়ি

কোদাল লইয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিল। অসংখ্য নরনারী গললগ্নীকৃতবাসে অনাবৃত পদে পদব্রজগামী রাজার অনুসরণ করিল। রাজাভরণ স্বরূপ বহুসংখ্যক গজবাজী ও অস্ত্র লগুড়াদি-ধারী মল্লরাজিও সঙ্গে যাইতে লাগিল।

অল্পক্ষণের মধ্যে এই প্রোৎসাহিত জনস্রোত জল স্রোতের ন্যায় সেই শিলাধিষ্ঠিত বনভূমিতে গিয়া উপস্থিত হইল। হয় হস্তী ও লোকজনের পদালোড়নে জঙ্গল নিরসনের পূর্ব্বেই বহুসংখ্যক তৃণগুল্ম সমূলোৎপাটিত হইয়া গেল। মুকুন্দও এই সময়ে সামান্যাকারে প্রাতঃকালিক পূজা সমাপন করিয়া শিলা সম্মুখে বসিয়া শিবশম্ভুর স্তব বন্দনাদি করিতেছিল। যথা সময়ে সে আসনত্যাগ করিয়া মহারাজের অভ্যর্থনা করিল। মহারাজ ভারামল্ল তাহাকে প্রত্যভিনন্দিত করিয়া সমাগত ব্রাহ্মণদিগকে অনতিবিলম্বে পূজার আয়োজন করিতে বলিলেন। অল্পক্ষণমধ্যেই অনুষ্ঠান সুসম্পাদিত হইলে রাজা বিবিধোপচারে নানাকারে পশুপতির পূজার্চ্চনা সমাপনকরিলেন এবং গললগ্নীকৃতবাসে করপুটে বলিতে লাগিলেন—

দাসে দয়াকর হে শিব শঙ্কর
আশুতোষ তব নাম।
নিতান্ত বাসনা করিয়া স্থাপনা
পুরাইব মনস্কাম ॥ (তারকমঙ্গল)

ইত্যাকার নানারূপ সাধ্যসাধনা করিয়া মহারাজ ভারামল্ল শিলোৎপাটনার্থ মৃত্তিকা খনন করিতে হুকুম দিলেন। রাজ-আদেশ ব্যর্থ হইবার নহে। একদিকে যেমন বহুলোকে মৃত্তিকা খননে নিযুক্ত হইল। অন্যদিকে তেমনি বহুসংখ্যক মজুর বনজঙ্গলাদি নিরসনেও ব্যাপৃত হইয়া পড়িল! অরণ্যসুন্দরী ভাবিল আর আমার এই নবীন নধর বিপুল দেহ খানির পরিত্রাণ নাই।

শিলা আনয়নে—চেষ্টা বৈফল্য।

শিবলিঙ্গোৎপাটনার্থ মৃত্তিকা খননের সম্পর্ক লইয়া নানালোকে নানা কথা কহিয়া থাকে। একপক্ষ বলেন দিব্য দিব্য সদাচারী সৎকুল সম্ভূত ব্রাহ্মণ এই খনন কার্য্য নিযুক্ত হইয়াছিল, মহারাজ ভারামল্ল ইতর লোকের দ্বারা ঐ কার্য্য সমাধা করাইবার প্রয়াস পান নাই। এ উক্তিটী কতদূর সত্য বলিতে না।

কারণ ছড়ায় দেখিতে পাইতেছি—

শত কোড়া নিয়োজিল কাটিবারে মাটী ;
যত খোড়ে তত বাড়ে পুষ্করিণীর জাটী ॥

এই জন্য বলিতে হয়——"কুলিকোড়া" বিস্তর এইকার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিল ; তবে শিবলিঙ্গের সমীপস্থ মৃত্তিকারাশি যে ব্রাহ্মণগণের দ্বারা অপসারিত করা হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। "তারকমঙ্গল" গ্রন্থে তাহাই বর্ণিত আছে। যথা—

"যতেক ব্রাহ্মণ করিতে খনন ;
লিঙ্গের নিকটে যায়।
কোদালি ধরিয়া মেদিনী কাটিয়া
তোলে মাটিস্তূপ প্রায় ॥"

রাজার আদেশে খনক গণ সমস্ত দিবসে আশাতীত মাটি তুলিয়া ফেলিল ; তাহার ফলে পুষ্করিণী প্রায় একটী মহাগর্ত্তের আবির্ভাব হইল। কিন্তু হায় শিলাখণ্ডের মূলদেশ কিছুতেই দেখিতে পাওয়া গেল না। মহারাজ ভারামল্ল বড় চিন্তিত হইলেন, ভাবিলেন "তবে কি আমার বাসনা সিদ্ধ হইবে না।

ক্রমেই রজনী সমাগমের বার্ত্তা লইয়া তদীয় দূতী সন্ধ্যা সমাগতা হইলেন। অগত্যা তখন নৃপতিকে খনন কার্য্য বন্ধ করাইতে হইল। তিনি খনকদিগকে বলিয়া দিলেন আজ এই পর্য্যন্ত কার্য্য বন্ধ থাক। কল্য আরও প্রত্যুষে আসিয়া পূজার্চ্চনাদি করিয়া—কার্য্যারম্ভ করান যাইবে। তখন—

"মনে মনে স্তুতি করে নরপতি
বলে রক্ষা কর মান।
দীনে পদাশ্রয় দেহ দয়াময়—
হয়ে মোরে কৃপাবান ॥"

এইরূপে স্তব বন্দনাদি করিয়া রাজা ভারামল্ল স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। অনুচর বৃন্দ ও যে যাহার গৃহে চলিয়া গেল। অন্যান্য লোকের জনতা ইতঃপূর্ব্বেই হ্রাস হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। এক্ষণে তাহা একেবারেই নিঃশেষিত হইয়া গেল। সেই অরণ্য প্রদেশে কেবল মুকুন্দ ঘোষ আর রাজার কয়েকজন প্রহরী মাত্র অবস্থান করিতে লাগিল।—

মহারাজ ভারামল্ল গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন বটে কিন্তু মন বড় নিরস হইয়া রহিল, কেবল তাহাই নহে সে দিবস আহার্য্য গ্রহণ পর্য্যন্তও করিলেন না। আত্মীয় স্বজন আসিয়া অনেক অনুরোধ করিলেন, পুরোহিত আসিয়া আহার করিবার বাধা নাই বলিয়া অনেক শাস্ত্রীয় বচন আওড়াইলেন, চাটুকারগণ আত্মীয়তা জ্ঞাপনের জন্য অনেক অনুনয় বিনয় করিল;—কিন্তু মহারাজ কিছুতেই উপবাস ব্রত ভঙ্গ করিলেন না; তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যদি তিন দিবস তিন রাত্রিতেও কার্য্যসিদ্ধি না হয় তাহা হইলেও উপবাস হইতে নিরস্ত হইবেন না। ফলে তাহাই ঘটিল। একদিন দুইদিন তিনদিন খননের পরও যখন শিবলিঙ্গোৎপাটনের কোন আশা ভরসা দেখিতে পাইলেন না—তখন বাস্তবিকই তিনি অলৌকিক বিস্ময়রসে পরিপ্লুত হইয়া গেলেন।

প্রতিদিবস শত শত ব্যক্তি প্রাণান্তিক পরিশ্রম করিয়া যে পরিমাণ মৃত্তিকা তুলিয়া আইসে পর দিবস রাজা গিয়া দেখেন তৎসমস্তই খনিত ভূভাগে নিপতিত হইয়াছে এবং গভীরতম মহাবিল সমতল হইয়া গিয়াছে। শান্তি প্রহরীর রীতিমত ব্যবস্থা অথচ তাহাদিগের অজ্ঞাতসারে প্রতিনিয়ত এই অলৌকিক ঘটনার অবতারণা! নরপতি যুগপৎ ক্ষোভাভিমানে অভিভূত হইতে লাগিলেন। ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার পুরাকালের কংসপুরীর কথা মনে পড়িয়া গেল, অমিততেজা উগ্রসেন তনয় স্বীয় ভগ্নীকে স্বামীসহ কারাগারে অবরুদ্ধ করিয়া—চৌকী প্রহরীর কতই না সুব্যবস্থা করিয়া ছিলেন, কিন্তু—তাহার ভিতর হইতেও তাঁহার নবজাত ভাগিনেয় কিরূপে স্থানান্তরে নীত হয়—বঙ্গের আবাল বৃদ্ধ বনিতা সে বিষয় অল্প বিস্তর অবগত আছেন।—মহারাজ সেই গুলি একবার নয়, বহুবার ভাবিলেন। ভাবিয়া স্থির করিলেন—দৈবপ্রভাবের নিকট শান্তি-প্রহরী-অতীব অকিঞ্চিৎকর। 'আমার প্রতি দৈবপ্রতিকূল সুতরাং বাসনা সিদ্ধি হইবে কেন?

বাস্তবিক পক্ষে রাজার ভাবনা অযৌক্তিক নহে। দেবতা অনুকূল থাকিলে—মানুষ শত সহস্র চেষ্টা করিয়াও কোন বিপদ ঘটাইতে পারে না। প্রহ্লাদের হস্তী পদতলে ও সাগর-মধ্যে নিক্ষেপেও যে মৃত্যু হয় নাই তাহার কারণ তখন তাহার প্রতি দেবতা প্রসন্ন ছিল—আর দেবর্ষি নারদের বীণাবিচ্যুত পুষ্পমাল্য সংস্পর্শে যে অজরাজ মহিষী ইন্দুমতীর দেহাত্যয় ঘটিয়াছিল তাহার কারণ তখন তাঁহার প্রতি দেবতা প্রতিকূল—ছিলেন; এই জন্যই

কবি বলিয়াছেন—ঈশ্বরেচ্ছায় কোথাও বিষ ও অমৃতের কাজ করিয়া থাকে—আর কোনস্থলে—অমৃত ও বিষের ন্যায় অপকার সাধন করে।

রাজা তারামল্ল ক্রমাগত তিন দিন যথোচিত চেষ্টা পাইলেন বটে কিন্তু তাঁহার সকল সাধে বাদ পড়িল—হরিষে বিষাদ হইল। নরপতির বহুসাধের বালির বাঁধ দৈবনিগ্রহের তুফানে কোথায় ভাসিয়া গেল—বহুসাধ করিয়া তিনি যে তেতাসের ঘর ফাঁদিয়াছিলেন—দুরদৃষ্টের, প্রবল-বাত্যায় তাহা কোথায় উড়িয়া গেল। অগত্যা তাঁহাকে তখন হাল ছাড়িয়া দিয়া বসিতে হইল;—

উপর্য্যুপরি তিন দিবস কাল তিনি দীনবেশে শিলাধিষ্ঠিত স্থানে গিয়া শিবলিঙ্গের যথোচিত স্তববন্দনাদি করিয়া খনন কার্য্য আরম্ভ করাইয়াছিলেন। ৪র্থ দিবসে আর তাঁহার সে আগ্রহ রহিল না। সে দিন তিনি স্বয়ং নাগিয়া প্রহরী সঙ্গে শিবপূজার সামগ্রী পাঠাইয়া দিলেন,—এবং আদেশ করিয়া পাঠাইলেন পুরোহিত মহাশয় অগ্রে যথোচিত ভক্তিসহকারে পূজার্চ্চনাদি করিলে তবে যেন অন্যান্য দিনের মত মৃৎখনন কার্য্য সমারব্ধ হয়। স্বামীর আদেশ—নরপতির আজ্ঞা; কে অমান্য করিবে?—যথাবিহিতোপচারে শঙ্করার্চ্চনা হইবার পর সেদিন ও অন্যান্য দিনের মত কার্য্য যথেষ্ট অগ্রসর হইল কিন্তু সেই এক ভাব। শিবলিঙ্গের মূলাবলোকন কাহারও ভাগ্যে ঘটিল না।—

মুকুন্দের কিন্তু ইহাতে বড় আনন্দ। তাহার ইচ্ছা নয় যে দেবাদিদেব মহাদেবের শিলামূর্ত্তি স্থানান্তরিত হউক। তবে রাজা তাহার প্রতিবাদী সুতরাং করিবে কি? বলিবে কি? বলিলেই বা শুনিবে কে? সুতরাং নীরবে সে মহাদেবকে জানাইতেছিল যাহাতে রাজার উদ্দেশ্য পূর্ণ না হয়। শুদ্ধ জানাইয়াই নিশ্চিন্ত ছিল না—যথাশক্তি পূজার্চ্চনাদিও করিয়া আসিতেছিল—এবং কুম্ভে ভরিয়া স্বীয় কপিলার দুগ্ধ আনিয়া শিবলিঙ্গের মস্তকে ঢালিয়া দিতেও নিরস্ত ছিল না।

এইরূপে দ্বাদশ দিবস অতিবাহিত হইল। রামনগর রাজ পূর্ব্বেই নিরাশা সমুদ্রে দেহ ঢালিয়া দিয়াছিলেন। এক্ষণে বারদিনের পর একপ্রকার স্থিরনিশ্চয় করিলেন,—আর বৃথা চেষ্টা!—অতএব আর অনর্থক চেষ্টা চরিত্র করিয়া কাল ও অর্থের অপব্যবহার করিবার আবশ্যক নাই।

দ্বাদশ দিবস খুঁড়ে অন্ত নাহি পায়।
যতখুঁড়ে ততশম্ভু পাতাল দিকে ধায়॥ (ছড়া)

ভক্ত দুঃখ পায় শিব ভাবিয়ে অন্তরে।
নিশারাত্রে বসে গিয়া রাজার শিয়রে॥ (ছড়া)

দুঃখবেগ পরিবর্দ্ধিত হইলে শরীরের লঘুতা আসিয়া উপস্থিত হয়। নিরাশাতাড়নায় জর্জ্জরিত লোকলজ্জায় ম্রিয়মান নরপতি খননারম্ভের দ্বাদশ-দিবসে রাত্রিতে শয্যাশায়ী হইয়া সাত পাঁচ ভাবিতে ভাবিতে গাঢ়নিদ্রায় অভিভূত হইলেন। করুণাময়ী নিদ্রা যেন তাঁহাকে দুঃখের দংশন ভুলাইবার জন্যই স্বীয় অঙ্কে স্থান দিলেন। গভীর নিশীথে নরপতি স্বপ্নে দেখিলেন ;—কে যেন তাঁহার শিরোদেশে দাঁড়াইয়া—

কহেন সন্ন্যাসী মূর্ত্তি ধরিয়া তখন।
শুন রাজা তারাচন্দ্র আমার বচন।
অকারণে দুঃখ পাইয়া মোরে কেন খোঁড়।
গয়াগঙ্গা বারাণসী এখানে সে জড়॥ (ছড়া) *

স্বপ্ন দর্শনে রাজার বিস্ময় দেখা দিল—আনন্দও জন্মিল। নির্ব্বাণ প্রায় দীপে তৈল প্রদান করিলে দশাবর্ত্তী আলোক যেমন পুনরায় হাসিয়া উঠে, জলাভাবে বিরসতাপ্রাপ্ত বৃক্ষবল্লরীর আলবালে বারি সেচন করিলে যেমন তাহা পুনর্ব্বার মসৃণ মুঞ্জরিত হইতে থাকে ; নিরাশহৃদয় নরপতির প্রাণেও সেইরূপ আশার আলোক আবার জ্বলিয়া উঠিল।

তবে এ আশার এ আনন্দের বিভিন্নতা আছে। যদি কেহ নবোদ্গত বৃক্ষকিশলয়ের হরিদ্রক্ততা ভাবের একত্র সম্মিলন হৃদয়ঙ্গম করিয়া থাকেন জলভার শূন্য শ্বেত সফেদ জলদপটলে গম্ভীর নিনাদী অম্বুবাহনিবহের যুগপৎমিলন যদি কাহারও চক্ষে পড়িয়া থাকে তাহা হইলে তিনি বুঝিয়া লইতে সক্ষম হইবেন যে জগতে বিরুদ্ধ ধর্ম্ম সমবায় অসম্ভব নহে। রাজা আনন্দিত হইলেন বটে কিন্তু সে আনন্দের সহিত একটু বিষাদের সংমিশ্রণও রহিল, তাঁহার নিরাশাবিশুষ্ক হৃদয়ে আশা কাদম্বিনী দেখা দিল বটে কিন্তু তাহাতেও শিলানয়ন বৈফল্য জনিত একটু নিরাশভাব জড়াইয়া রহিল। জগতে এ দৃশ্য দুর্লভ নহে।

---

* ছড়ায় স্বপ্ন সংক্রান্ত এইটুকু মাত্র বর্ণনা সন্নিবিশিষ্ট আছে। গ্রন্থবিশেষে কিন্তু এই বিষয় লইয়া বহু বাগবিন্যাসের অবতারণা করা হইয়াছে। স্বপ্নদৃষ্ট মহাদেবের রূপ বর্ণনা ব্যতীত তদীয় প্রত্যাদেশ ব্যাপার লইয়াও অনেক কার্য্য (তারকেশ্বর ধামেমন্দির নির্ম্মাণ পুষ্করিণী খনন ইত্যাদি সংক্রান্ত) বলা হইয়াছে। স্বপ্নে দৃশ্যের এত ব্যাপারের পর্য্যবেক্ষণ সম্ভবপর কিনা। পাঠক পাঠিকা মাত্রেই তাহা বিবেচনা করিবেন।

স্বপ্নদর্শনের পর শঙ্কর স্মরণ করিয়া রাজার রাত্রি কাটিয়া গেল। তিনি বেশ বুঝিয়া লইলেন যে স্বপ্নদৃষ্ট ব্যক্তিকে? এবং স্বপ্নাদিষ্ট বিষয় কিরূপ অনুপালনীয়। পরদিন প্রভাতে সভা আহূত হইল, পাত্র মিত্র পুরোহিত আর মন্ত্রী সভাসদে সভাগৃহ পূর্ণ হইয়া গেল, মহারাজ স্বয়ং রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট হইলেন।

অবিলম্বে মঙ্গলবাদ্য বাজিয়া উঠিল! নাগরা নহবতের সুমধুর রোলে সকলের প্রাণে নবোদ্যম জাগিয়া উঠিল। প্রায় বারদিনকাল রাজপুরী ম্রিয়মানা ছিল। নৈরাশ্যের ত্বরপনেয় মাদকতায় সকলে বিহ্বল হইয়া গিয়াছিল। দিনদ্বাদশান্তে পুনরায় দামামা দগড় বাদ্যে লোকের সেভাব অপনীত হইয়া গেল।

সভারম্ভের কিয়ৎক্ষণ পরে রাজা স্বকীয় স্বপ্নবৃত্তান্ত সকলের সাক্ষাতে অব্যাজে ব্যক্ত করিলেন। তচ্ছ্রবণে সকলের মনেই অভূত পূর্ব্ব বিস্ময়ের আবির্ভাব হইল এবং রাজার পুণ্যবত্তার কথা স্মরণ করিয়া অনেকেই তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারিলেন না।

গুরু গম্ভীর স্বরে রামনগর নাথ এই আজ্ঞা সকলের সাক্ষাতে বিজ্ঞাপিত করিলেন যে—অবিলম্বে শিলাধিষ্ঠিত স্থানের বনজঙ্গল সমুন্মূলিত করা হউক, মন্দির নির্ম্মাণ ও সরোবর খনন অনতিবিলম্বে আরব্ধ হউক।

সকলেই রাজার আদেশ আগ্রহের সহিত সমর্থন করিলেন! তখন শত শত শ্রমজীবী কুলীমজুর রামনগরের প্রান্তবর্ত্তী সেই শিলাধিষ্ঠিত স্থানের দিকে অগ্রসর হইল। দর্শকবৃন্দের জনতা আবার পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। আবার নিরানন্দ স্থানে আনন্দের সঞ্চার হইল।

সভ্যগণ—পরিবৃত মহারাজ ভারামল্ল সকলের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। মুকুন্দ পূর্ব্ব হইতেই কানন মধ্যে আশ্রয় লইয়াছিল ও যথা শক্ত্যুপচারে পূজাদি করিয়া আসিতেছিল। তাহারভাগ্যে যে দিন প্রথম শিলা সাক্ষাৎকার লাভ হয় সেইদিন হইতেই যেন সে কিছু সংসারাসক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার পর যেদিন সে স্বপ্নযোগে প্রত্যক্ষ করে—বনমধ্যস্থ শিলাখণ্ডে যে ধান্য পেষণকার্য্য রাখাল বালকগণের দ্বারা সমাহিত হইয়া আসিতেছে পরম কারুণিক শিবের পক্ষে তাহা অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে; সেই দিন হইতে তাহার বিষয় বিরক্তির ভাব আরও প্রবল হইয়া উঠে। এই স্বপ্নদর্শনের অব্যবহিত পরেই

সে শিলাসংক্রান্ত বৃত্তান্ত রামনগর রাজার নিকট গিয়া ব্যক্ত করে এবং ঠিক এই সময় হইতেই, মস্তক মুণ্ডন পূর্ব্বক গৈরিক ধারণ করিয়া—

লইয়ে মোহান্ত আখ্যা রহে শিবালয়ে।
সতত পূজেন শিবে শুদ্ধ চিত্ত হইয়ে॥ (ছড়া)

সুতরাং আর বলিবার আবশ্যক নাই যে—রাজা শিলোৎপাটনের চেষ্টায় বদ্ধপরিকর হইলেও মুকুন্দ সেই পুণ্যময় কানন পরিত্যাগ করিয়া যায় নাই! আবশ্যকানুসারে তাহাকে কোন কোন সময় বাটী যাইতে হইত বটে কিন্তু অধিক সময় সে শিবলিঙ্গের সেবায় অঙ্গরাগে, পূজার্চ্চনায় রত থাকিত। এজন্য দেশে বিদেশে "গোয়ালার ঠাকুর" বলিয়াও শিবশিলার একটু কুখ্যাতি রটিয়াছিল!

রাজা শিবশিলাকে স্থানান্তরিত করিবার জন্য যে কায়মনোবাক্যে চেষ্টা করিয়াছিলেন ইহাও তাহার এক অন্যতম কারণ। দেবাদিদেব মহাদেবের স্বয়ংমাবির্ভূত লিঙ্গ শিলাকে লোকে গোয়ালার ঠাকুর বলিয়া পাছে পূজার্চ্চনা না করে, পাছে তাঁহাকে সমুচিত সম্মান প্রদর্শন করিয়া না চলে এভাবনা রাজার বিষম হইয়া পড়িয়াছিল। তাই রাজা স্বীয় বাটীতে শিলানয়ন অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন, কিন্তু বিধিবৈরূপ্যে যখন তাঁহার সে বাসনাসিদ্ধির উপায় দেখিলেন না; অপিচ স্বপ্নযোগে পর্য্যবেক্ষণ করিলেন তদীয় বাসনা পূর্ণ হওয়া অসম্ভব; তখন অগত্যা মন্দিরাদি নির্ম্মাণ করাইয়া পূজাদির ব্যবস্থা করাইয়া দেওয়াই তিনি "অসারে জলসার" স্থির করিলেন, এবং তদুদ্দেশ্যেই বন প্রদেশে স্বদলবলসহ গিয়া উপস্থিত হইলেন।

রাজাকে দেখিয়া মুকুন্দ সম্মান প্রদর্শনের ক্রটী করিল না বটে কিন্তু সে অভ্যর্থনায় যেন একটু কুণ্ঠার ভাব সন্নিবদ্ধ হইয়া রহিল, মুকুন্দ ভাবিল আবার বুঝি নূতন পদ্ধতিতে শিলাপনয়নের চেষ্টা হইবে!!

রাজা কিন্তু মুকুন্দের মনের ভাব অলক্ষিতভাবে উপলব্ধি করিয়া লইলেন তখন তিনি মৃদুমধুর বচনে তাহাকে কহিলেন,—গোপনন্দন তোমার বাসনাই পূর্ণ হইয়াছে। আমার সাধনায় কিছুই হইল না। দেবাদিদেব মহাদেব এস্থান ত্যাগ করিয়া যাইবেন না অতএব এই স্থানেই তাঁহার মন্দিরাদি নির্ম্মাণ করাইয়া দেওয়া সমীচীন মনে করিয়াছি।

যদি এককালে একছত্রাধিপতিত্ব বিশিষ্ট রাজ্য প্রদত্ত হইত তাহা হইলে

তাহাতে মুকুন্দ যত না আনন্দ অনুভব করিত রাজার মুখে শিবশিলা স্থানান্তরিত করা হইবে না শুনিয়া সে ততোধিক আনন্দে আনন্দিত হইল। রাজা কিন্তু তাহার সে মানসিকভাব অনুভব করিতে পারিলেন না।

যাহা হউক মহারাজ ভারামল্ল ষোড়শোপচারে বিধিমত প্রকারে শিবলিঙ্গের পূজা করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে আরতির বাদ্য বাজিয়া উঠিল, ধুনা ধূমে বনভূমি সমাচ্ছাদিত হইয়া গেল, ধূপ গুগ্‌গুলের সৌগন্ধ দিঙ্‌মুখ সুরভি করিয়া তুলিল, ভক্তের প্রাণ ভক্তিভাবে দ্বিগুণ পুলকিত হইয়া উঠিল। আগন্তুকদিগের মধ্যে অনেকেই দুধ সিদ্ধি ঢালিয়া পুষ্প বিল্বপত্র দিয়া ওলাচিনি মধু আনিয়া ধূপ দীপ জ্বালিয়া নৈবেদ্যাদি করিয়া শিবলিঙ্গের পূজা করিতে লাগিল। মহাদেবের আদেশছিল আচাণ্ডালব্রাহ্মণ কাহাকেও শিবলিঙ্গের পূজা করিতে নিষেধ করা না হয়। প্রস্তাবিত দিবসে সেই নিষেধের অনুকূলে কার্য্য হইল।

মহারাজ ভারামল্ল সমস্ত দিবস বনপ্রদেশে অবস্থান করিয়া শঙ্করের সান্ধ্যবন্দনাদি সমাপন পূর্ব্বক স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন, যে বনভূমি পূর্ব্বে দস্যুতস্করের আবাস ভূমি ছিল তাহা এক্ষণে লোক যাতায়াতের লীলাভূমি হইয়া পড়িল। হিংস্রজন্তুগণ আর সে স্থানে তিষ্ঠিয়া থাকিতে পারিল না। বন এক্ষণে নগরে পরিণত হইতে চলিল। মুকুন্দের ইহাতে অমিত আনন্দ। সে যাহা চাহিতেছিল শঙ্করের কৃপায় তাহাই কার্য্যে পরিণত হইবার সূচনা হইল! সুতরাং তাহার আনন্দ না হইবে কেন?

মন্দির-নির্ম্মাণ!

ভয় ভাবনায় রাত্রি কাটিয়া গেল। দেবপুরী নির্ম্মাণের চিন্তায় রাজার ভালরূপ নিদ্রা হইল না। নদীর স্রোত ফিরিয়া বহে না, সূর্য্যের উদয় বিভিন্ন

দিকে হয় না, বৈধসী লিপীর পরিবর্ত্তন ঘটে না. কিন্তু মানুষী চেষ্টার স্রোত ফিরিয়া যায় এই জন্যই মনুষ্যের মনুষ্যত্ব এবং এই কারণেই তাহাদিগের কল্পনার নশ্বরত্ব ; আর এই জন্যই মানবীয় চেষ্টার অতীবাকিঞ্চিৎ কারীত্ব।

যে রাজা এত দিন চেষ্টা পাইয়াছিলেন যে কোন প্রকারে হউক শিবশিলা-খানি উপড়াইয়া লইয়া যাইবেন, সেই অমিত লোকবলশালী নরপতিকেই ঘটনাক্রমে সে চেষ্টা পরিত্যাগ করিতে হইল। এখন তাঁহার চিন্তা হইল কেমন করিয়া কোথা হইতে সৎ মিস্ত্রী আনিয়া শিবমন্দিরাদি নির্ম্মাণ করাইবেন। পরিবর্ত্তনশীল জগতে কিছুই অসম্ভব নহে।

যাহা হউক শৈবরাজা ভারামল্ল বহু চিন্তায় সে রাত্রি যাপন করিলেন। পরদিন প্রভাতে উঠিয়া তিনি বন প্রদেশে গমন করিলেন পূর্ব্ব হইতেই প্রহরী নিযুক্ত ছিল ও বহু জনমজুর বন জঙ্গলাদি অপসারিত করিতেছিল; এক্ষণে রাজাকে দেখিয়া তাহারা দ্বিগুণ কার্য্যতৎপরতা দেখাইয়া স্ব স্ব কার্য্য সমাধা করিতে লাগিল।

রাজাজ্ঞায় সেই অনাবৃত প্রদেশ অল্পক্ষণ মধ্যে বিচিত্র চন্দ্রাতপে আচ্ছাদিত হইল। বাহকশকটে মন্দির নির্ম্মাণোপযোগী উপকরণ সকল আনীত হইতে লাগিল। স্থপতিবিদ্যায় সুনিপুণ মিস্ত্রী অন্বেষণের জন্য দেশে বিদেশে লোক প্রেরিত হইল। ধীমান ভূপতি কর্ম্মচারীবৃন্দের উপর আদেশ করিলেন—"যত কিছু ব্যয় হয় হইবে কিন্তু একমাসের মধ্যে সমুদয় সঙ্কল্পিত কার্য্য নির্ব্বাহ করাইয়া দিতে হইবে।"

এখন হইতে প্রতি দিবস রাজবাটীর পূজানুষ্ঠানকারী "সদানন্দ" আসিয়া এই অভিনব দেবালয়ে দেবসেবার আয়োজন করিতে লাগিলেন এবং মহারাজ ভারামল্ল প্রতিদিন এই স্থানে আসিয়া পূজার্চ্চনাদি করিয়া রাত্রিতে বাটী প্রত্যাবর্ত্তন করিতে লাগিলেন। ভোগরাগ, সেবা শীতল, দীয়তাম্ ভুজ্যতাম্ রীতিমত ভাবে চলিতে লাগিল। সকলে মনে করিয়া রাখিবেন যদিও তারকনাথের ছড়ায় লিখিত আছে—

রামনগরের সীমামধ্যে বন ত্রিপুরারি।
ভারামল্লের কি সৌভাগ্য বাই বলিহারি॥

তথাপি সেই শিলাধিষ্ঠিত স্থানটীর তখন আর একটী নাম ছিল—তাড়পুর। তাড়পুর বালিগড়ি পরগণার এলাকাভুক্ত ছিল; মহারাজ ভারামল্লের চেষ্টায় অথবা দেবাদিদেব মহাদেবের কৃপায় তাড়পুরের সেই বনভূমি আজ নগরে পরিণত হইতে চলিল। বঙ্গদেশে এইসময়ে একজন রাজমিস্ত্রির বড় সুনাম সুখ্যাতি ছিল!—তাহার নাম "জনার্দ্দন"। জনার্দ্দনকে চলিত কথায় 'জুনারী'* বলিত। স্থপতি বিদ্যাকুশল এই ব্যক্তি মহারাজের সঙ্কল্পিত এই অভিনব শিবমন্দির-নির্ম্মাণের জন্য আনীত হইল।

শুভদিনে শুভক্ষণে মন্দির নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ হইল। রাজার আয়োজনোদ্যোগের ব্যয় নির্ব্বাহের কিছু অভাব ছিল না, সুতরাং কার্য্য শীঘ্র শীঘ্র অগ্রসর হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে মাসেককাল মধ্যে মন্দির নির্ম্মাণ-কার্য্য সমাপ্ত হইয়া গেল। মন্দিরের দক্ষিণ দিকে একটি মাত্র দ্বার রাখা হইল; জুনারী বলিয়াছিল আর একটী দ্বার রাখা হউক কিন্তু রাজা তাহার অনুমোদন করিলেন না, যে স্থানে দেবাদিদেব শিবশম্ভুর লিঙ্গশিলা প্রতিষ্ঠিত ছিল সেই স্থানটি প্রস্তর দ্বারা বাঁধাইয়া দেওয়া হইল। মন্দিরটী অপেক্ষাকৃত ছোট হইল দেখিয়া কেহ কেহ একটু অনুযোগ করিতে লাগিল। রাজা তাহাতে বেশী ক্ষুণ্ণমনা হইলেন না। কারণ তিনি জানিতেন জনার্দ্দিন যাহা করিয়াছে তাহা সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর। ইহার পর

অকাতরে নৃপবর ব্যয় করি ধন।
দীর্ঘ সরোবর শীঘ্র করিল খনন॥ (তারক মঙ্গল)

বর্ত্তমান সময়ে তারকনাথ-মন্দিরের পশ্চিমাংশে যে সরোবর পরিদৃশ্যমান, ইহাই রাও ভারামল্লের খনিত পুষ্করিণী। প্রথমে শিলোৎপাটনার্থে মৃত্তিকা স্তূপ উত্তোলিত করায় এই স্থানে যে একটি মহাবিল হইয়াছিল, রাজার

* জুনারি ইতরজাতীয় হিন্দু ছিল, বঙ্গের বহুস্থানের প্রাচীন দেব মন্দিরাদি তাহার নির্ম্মিত। তাহার গাঁথা সৌধভবনাদি অতীব মজবুত ও বহুকাল স্থায়ী হইয়া থাকে। এখনও তাহার হাতের গঠিত প্রাচীন অট্টালিকাদি অনেক স্থানে বর্ত্তমান আছে,

বর্ত্তমান তারকনাথ দেবের যে মন্দির দেখা যায়, তাহা স্বর্গীয় গোবর্দ্ধন রক্ষিতের বায়ে জুনারি মিস্ত্রির গঠিত সেই দুর্ভেদ্য মন্দিরের উপর সন ১১৮৭ সালের পূর্ব্বে নির্ম্মিত। সুতরাং বুঝা যাইতেছে প্রাচীন মন্দিরটী বর্ত্তমান মন্দির দ্বারা আচ্ছাদিত আছে।

আদেশে তাহাই শেষে পুষ্করিণী রূপে খনিত হয়। এই সরোবরকে চলিত কথায় "দুধপুকুর" এবং একটু সাধুভাষায় শিবগঙ্গা কহে। শিবগঙ্গার মাহাত্ম্য পূর্ব্বে যথেষ্ট ছিল। চৈত্রমাসের সংক্রান্তির পূর্ব্বদিবস ইহাতে জোয়ার ভাটা খেলিত। কাল ক্রমে বসুন্ধরা পাপাপূর্ণময়ী হওয়ায় তাহা বিলুপ্ত হইয়াছে। শুনা যায় যখন এই সরোবরে জোয়ার হইত তখন লোকে ইহাকে গুপ্ত গঙ্গা বলিয়া মনে করিত এবং শিবশম্ভু তারকনাথ বাবার পূজাদির জন্য গঙ্গা সলিল বলিয়া ইহা ব্যবহৃত হইত। বর্ত্তমান সময়ে সে জোয়ার পরিদৃষ্ট না হওয়ায় দূরবর্ত্তিনী গঙ্গানদী হইতে জল আনাইয়া বাবার পূজাদি করাইতে হয়।

রাজা ভারামল্ল পুষ্করিণী খনন করাইয়া নিরস্ত হয়েন নাই, মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াই তিনি কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন নাই; খনিত সরোবরের ঘাটটি তিনি পরিপাটি রূপে বাঁধাইয়া দিয়াছিলেন, তাহা ছাড়া বন জঙ্গল অপসারিত করাইয়া আম, জাম, গুবাক, নারিকেল প্রভৃতি নানা ফলের গাছ এবং চম্পক, কলিকা, ধুস্তুর, আকন্দ (অর্ক) প্রভৃতি পুষ্প বৃক্ষ সকল প্রচুর পরিমাণে রোপণ করিতেও ছাড়েন নাই

শিবশম্ভু তারকনাথ বাবার বর্ত্তমান সময়ে অনেক গুলি নাম প্রচলিত আছে ও সধারণের দ্বারা সেই সকল নাম ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে যথা—

(১) তারকেশ্বর (২) তারকনাথ (৩) তারেশ্বর (৪) টাড়েশ্বর

ইহাভিন্ন অনাথলিঙ্গ বা অনাদিলিঙ্গ এই দুইটি সংজ্ঞাও কেহ কেহ ব্যবহার করিয়া থাকেন। অনাদিলিঙ্গ শব্দের অর্থ=অনাথের অর্থাৎ অনন্যগতি ব্যক্তির আশ্রয়নীয় লিঙ্গ। অথবা অনাথের (আত্মীয় বান্ধবহীনের ত্রিকুটসামীর প্রতিষ্ঠিত লিঙ্গ ঐ অর্থ করিলেও করা যায়, আর অনাদিলিঙ্গের অর্থ বুঝা কঠিন নহে যে লিঙ্গের আদি নাই তাহাই অনাদি লিঙ্গের সংজ্ঞা আখ্যাত।

এই দুই নামের ব্যুৎপত্তিতে কিছু অসামঞ্জস্য নাই কিন্তু প্রাগুক্ত নাম চতুষ্টয়ের রহস্য ভেদ হওয়া ব্যুৎপত্তি রহস্যের উদ্ভাব করা কিছু দুরূহ। বহুদিন পূর্ব্বে এক খানি সাপ্তাহিক পত্রে পাঠ করিয়াছিলাম=তাড়পুরের বনে আবির্ভূত হইয়াছিলেন বলিয়া শিবশম্ভুর নাম তাড়েশ্বর হইয়াছিল। লেখকের একথা অসঙ্গত

নহে। কিন্তু তাই বলিয়া যে তাড়েশ্বর শব্দটী টারেশ্বরে পরিণত হইয়াছে এমন কথা আমরা বলিতে পারি না। তারকেশ্বর ধামের আবিষ্কার কালে সেই স্থানে বহু টাউর (নাটা) কাঁটার বন ছিল, সেই বনের অধীশ্বর রূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন বলিয়াই শিবশম্ভুর নাম হইয়াছিল টাউরেশ্বর। সেই টাউরেশ্বরই কালক্রমে সঙ্কুচিত বা পরিবর্ত্তিত হইয়া টারেশ্বর বা টাড়েশ্বরে পরিণত হইয়াছে। তারকনাথ নাম শিবশম্ভুর নিজাবিষ্কৃত মুকুন্দ ঘোষের নিকট তদীয় স্বপ্নযোগে তিনি আপনাকে তারকনাথ নামেই পরিচয় দিয়াছিলেন। যথা—তারকনাথ শিব আমি কানন নিবাসী।

মম পূজা কর বাছা হওরে সন্ন্যাসী॥ (ছড়া)

তাহার পর তারকেশ্বর শব্দের ব্যুৎপত্তি অনেকের মতে ইহাই মহারাজ ভারামল্লের রক্ষিত সংজ্ঞা। তাহাই কিছুকালপরে টাউরেশ্বর, তাড়েশ্বর ইত্যাদিতে পরিণত হইয়াছে। আমাদের মনে হয় এক তারক নাথ ব্যতীত তিনটি আখ্যাই মহারাজ ভারামল্লের রক্ষিত ও প্রচারিত। কারণ সংজ্ঞা ত্রয়েরই ব্যুৎপত্তিগত সার্থকতা রহিয়াছে॥

তারকেশ্বর তীর্থের আবিষ্কার হইল; বাগান বাগিচা, মন্দির সরোবর প্রভৃতি করাইয়া রাজা যথেষ্ট যশোপার্জ্জন ও পুণ্যসঞ্চয় করিলেন কিন্তু তাঁহার সকল সাধে বাদ পড়িল। নানাস্থান হইতে অন্যান্য জাতি আসিয়া শিবশম্ভুর পূজা করিতে লাগিল বটে, কিন্তু রাঢ়দেশীয় ব্রাহ্মণগণ প্রায় পূজা করিতে আসিলেন না; মুকুন্দ ঘোষের প্রকাশিত শিবলিঙ্গ অতএব গোয়ালার ঠাকুর বলিয়া তাঁহারা কিঞ্চিৎ ঘৃণা করিতে লাগিলেন অধ্যাপকদিগের সহিত তর্ক বিতর্ক করিতে যাইলে তাঁহারা শাস্ত্রদেখাইতেন।

নমেন্মঃ শূদ্র সংস্পৃষ্টং লিঙ্গং বা হরিমেব বা

সঃ সর্ব্ব যাতনাভোগী যাবদাহুত সংপ্লবং॥ দেবপ্রতিষ্ঠাতত্ত্ব

ব্রাহ্মণগণের প্রতিকূলতায় শিবশম্ভু তারকনাথ বাবার মাহাত্ম্য সাধারণ ভক্তবৃন্দের গোচরীভূত হইতে পারিতেছেনা দেখিয়া মুকুন্দ ঘোষ বড়ই কাতর হইল এবং রাজাকে জানাইল আপনি অনুমতি করেন ত আমি তারকেশ্বর ধাম ছাড়িয়া চলিয়া যাই। রাজা কাহলেন আমি তোমায় এরূপ আদেশ দিতে পারি, না কারণ তুমি শিবানুগ্রহে ভৈরবত্ব প্রাপ্ত হইতে চলিয়াছ; তোমাকে কোন কার্য্য করিতে বাধ্য করা আমার ক্ষমতাধীন নহে। শিবশম্ভু তারক নাথ বাবার

প্রতাপ থাকে, যে কোন প্রকারে হউক এ অযথা কলঙ্ক বিদূরিত হইবে। যাহারা গোয়ালার শিব বলিয়া অযথা ঘৃণা করিত শিংটী শিবপুর * নিবাসী চতুর্ভুজ গাঙ্গুলী তাহার অন্যতম। চতুর্ভুজ শাস্ত্রজ্ঞানী অধ্যাপক হইলেও গোয়ালার ঠাকুরবলিয়া ভুল বিশ্বাস করিতেন। যে সময় দেশে বিদেশে তারক নাথ বাবার এই কুখ্যাতি রটিতে ছিল ঠিক সেই সময়ই একদিন তিনি বেলা দ্বিপ্রহরের সময় স্নানার্থ বাটির নিকটবর্ত্তী একটী পুষ্করিণীতে যাইতেছিলেন পথিমধ্যে একবৃদ্ধ ব্রাহ্মণের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয়। ব্রাহ্মণ চতুর্ভুজকে ডাকিয়া তারকেশ্বর তীর্থের কথা বিজ্ঞাপিত করিলেন এবং তত্রত্য শিবের মাহাত্ম্য ও উৎপত্তি সম্বন্ধে অনেক কথা জানাইয়া তাহার পর পৌরহিত্য স্বীকারের জন্য অনুরোধ করিলেন চতুর্ভুজ সম্মত না হইয়া বরং গোয়ালার শিবপূজায় পাতিত্য আছে বলিয়া তাহার সার্থক অনেক বচন আওড়াইলেন এবং পৌরহিত্য স্বীকার করিলে কেহ তাঁহার বাটিতে খাইবেন না, তিনি একঘরে হইবেন ইত্যাদি নানা আপত্তি করিয়া চলিয়া যাইতে লাগিলেন, তখন বৃদ্ধ পুনশ্চ তাঁহাকে ফিরাইয়া বলিলেন যদি তুমি আমার কথা স্বীকার না কর তাহা হইলে তোমার সর্ব্বনাশ হইবে; এই কথা শুনিতে না শুনিতেই চতুর্ভুজের দৃষ্টি ব্রাহ্মণের ললাটফলকে নিপতিত হইল। তিনি দেখিয়া অবাক হইলেন ব্রাহ্মণের ৩টী চক্ষু রহিয়াছে। আর তাঁহার কোন কথা বুঝিতে বাকি রহিল না তখন তিনি ব্রাহ্মণের পদদেশে পড়িয়া অপরাধ মার্জ্জনা প্রার্থনা করিলেন; তখন সেই বৃদ্ধ বেশী ব্রাহ্মণও সহসা শিব মূর্ত্তিতে ক্ষণ কালের জন্য দেখা দিয়া কোথায় চলিয়া গেলেন. এইবার গঙ্গোপাধ্যায়ের সকল ভ্রম ঘুচিল। তিনি প্রেমাশ্রুপূর্ণ নয়নে শিবশম্ভুকে বারংবার উদ্দেশে প্রণাম করিয়া স্নানান্তে পরমপুলকিতচিত্তে বাটীতে ফিরিলেন, এবং মহাসমারোহে শিবপূজা সমাপন করিলেন। তৎসংক্রান্ত সেই অলৌকিক বৃত্তান্ত যে শ্রবণ করিল সেই সাতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া তাঁহাকে শাপভ্রষ্ট শিবানুচর বলিয়া অনুমান করিতে লাগিল;—কত লোক আসিয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ দিল কত কুলবালা আসিয়া স্বীয় সন্তান সন্ততির মস্তকে তদীয় পদধূলি নিক্ষেপ করিল কে তাহার ইয়ত্তা করিবে?

স্নান প্রত্যাগত গঙ্গোপাধ্যায়কে দেখিয়া সকলের আশ্চর্য্যান্বিত হইবার আরও একটী কারণ ছিল এই—যে তাঁহার অঙ্গ বিকলতা সহসা কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছিল। বহুদিন যাবৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের চরণ যুগল শ্লীপদ (গোদ) রোগাক্রান্ত ছিল এবং একটী চক্ষুঃ দৃষ্টিহীন হইয়া গিয়াছিল। এক প্রহর পূর্ব্বে যে ব্যক্তি এতাদৃশ বিকলাঙ্গ হইয়া স্নানার্থ গিয়াছিল, স্নানান্তে ফিরিয়া আসিয়া সেই ব্যক্তি দৃষ্টি বৈক্লব্যবিহীন, শ্লীপদ রোগমুক্ত দিব্য দেহীরূপে পরিদৃশ্যমান হইল; ইহা কি স্বল্প বিস্ময়ের কথা! চতুর্ভুজের এই অলৌকিক রূপ পরিবর্ত্তন প্রত্যক্ষ করিবার জন্য দলে দলে লোক সমাগত হইতে লাগিল। না হইবে কেন? বৈচিত্র্যময় আকস্মিক পরিবর্ত্তন নানা কৌতুহলজনক হইয়া থাকে।

চতুর্ভুজের তারকেশ্বরধামে আগমন।

মানসিক আনন্দের পরাকাষ্ঠা মানুষকে ক্ষুৎপিপাসাদির কষ্ট ভুলাইয়া দেয়। সার্থকজন্মা গঙ্গোপাধ্যায় ঘটনা বৈচিত্র্যময় সেই শুভদিন নিরাহারে যাপন করিলেন, কিন্তু তাঁহার কোন প্রকার কষ্টানুভব হইল না।

দেখিতে দেখিতে ধরণী ধূসরবাসে আবৃতা হইল। বনের পশু, গাছের পাখী, ঘরের মানুষ সকলেই দৈনিক পরিশ্রম সমাধা করিয়া বিশ্রামলাভে যত্নবান হইল। চতুর্ভুজের কিন্তু বিশ্রাম নাই, তিনি বিপ্রবেশী শিবশম্ভুর আদেশ পালন করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছেন। সর্ব্বাগ্রে সমভিব্যাহারে যাইবার জন্য তিনি স্বীয় পত্নীকে অনুরোধ করিলেন। কারণ তাঁহার জানা ছিল—"সস্ত্রীকো ধর্ম্মমাচরেৎ" (স্ত্রীর সহিত ধর্ম্মাচরণ করিবে) চতুর্ভুজ ৺ তারকেশ্বরধামে শিবসেবার দ্বারা ধর্ম্মার্জ্জন করিতে চলিয়াছেন সুতরাং পত্নী তাঁহার সহযাত্রী না হইবেন কেন? ব্রাহ্মণী বিনা বিবেচনায় ব্রাহ্মণের বাক্যে স্বীকৃতা হইলেন। যেমন স্বামী তেমনই স্ত্রী। যোগ্যে যোগ্যে সম্মিলন হইয়াছিল। সাধে কি আর কবি বলিয়াছেন—

নিশা শশাঙ্কং শিবয়া গিরীশং পরস্পরং যোজয়তঃ প্রতীতঃ।
বিধেরপি স্বারসিকঃ প্রয়াসঃ পরস্পরং যোগ্য-সমাগমায়॥
(নৈষধচরিত)

সিংটীশিবপুর হইতে তারকেশ্বর বড় অল্প দূর নহে। সতী সাধ্বী কামিনী স্বামীসঙ্গে পদব্রজে তত পথ অতিক্রম করিতে কিছুমাত্র অসম্মতি প্রদর্শন

করিলেন না, ইংরাজীতে একটা কথা আছে=Face is the Index of the mind (অর্থাৎ মুখমণ্ডল অন্তঃকরণের সূচীপত্র, ইহার অর্থ এই যে অন্তঃকরণে সুখ দুঃখাদি যে ভাব নিহিত থাকে মুখ দেখিলেই তাহা অনুভব করিয়া লওয়া যায়।)

ব্রাহ্মণীর মুখমণ্ডল দেখিয়া অনেকেই তখন বুঝিয়াছিল—ঘর সংসার ছাড়িয়া সন্তান সন্ততি ফেলিয়া স্বামীসঙ্গে তারকেশ্বর ধামে গিয়া তিনি শিবসেবায় জীবন যাপন করিতে অণুমাত্র দুঃখিত হন নাই।

যাহা হউক শঙ্করস্মরণে রজনী অতিবাহিত হইল। শেষ রাত্রিতে চতুর্ভুজ পত্নীকে লইয়া "ব্যোম ভোলানাথ" শব্দে দিগ্বিদিক প্রতিধ্বনিত করিয়া বাটীর বাহির হইলেন, এখনও তাঁহার সেই প্রসন্নভাব, সেই আন্তরিক উদ্যমের আত্যন্তিকতা অণুমাত্র বিপর্য্যস্ত হয় নাই। সমস্ত দিনের উপবাস ব্রাহ্মণকে অণুমাত্র ক্ষিন্ন করিতে পারে নাই। চতুর্ভুজ একমনে তারকেশ্বরাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। স্কন্ধে তাঁহার একখানি চাদর তাহাও জীর্ণ, পরিধানে একখানি থানধূতি—সেখানি কথঞ্চিৎ ফরসা, বগলে একটী ছিন্ন ছত্র, আর পশ্চাৎ ভাগস্থ কটিদেশে গাত্রমার্জ্জনী (গামছা) বদ্ধ কয়েকখানি পরিধেয় বস্ত্রপূর্ণ একটী গাঁটরী।

পশ্চাৎ পশ্চাৎ যিনি যাইতেছিলেন তাঁহারও বেশভূষার তাদৃশ পারিপাট্য ছিল না। হস্তে লৌহ ও শঙ্খাভরণ, সীমন্তে সিন্দুরছটা আর পরিধানে একখানি ৪ অঙ্গুলি চওড়া পাড় বিশিষ্ট লাল পাড় শাড়ী। পাঠক কেমন দৃশ্য দেখিলেন, আজ কালকার কয়জনে এমন বিলাসবর্জ্জিত—সাদাসিধা অমায়ী হইতে পারে বলুন দেখি? হইতে পারে না বলিয়াইত এত দুঃখ; এত অভাব; ও এত আর্ত্তনাদ।

দণ্ডের পর দণ্ড যাইতেছে—প্রহরের পর প্রহর অতীত হইতেছে চতুর্ভুজের কিন্তু সে দিকে দৃষ্টি নাই। তিনি একমনে তারকেশ্বরের দিকে চলিয়াছেন। মাঠের পর মাঠ, গ্রামের পর গ্রাম, অরণ্যের পর অরণ্য অতিক্রম করিয়া মধ্যাহ্নকালে তিনি তারকেশ্বরধামে গিয়া উপস্থিত হইলেন। মনে করিয়াছিলেন বিদেশ বিভুমে গিয়া অপরিচিত বলিয়া কত অসুবিধায় পড়িবেন। কিন্তু দেবাদি-দেবের কৃপায় তাঁহাকে তথায় কোন অসুযোগ অবলোকন করিতে হইল না।

মঠাধ্যক্ষ মুকুন্দ ঘোষ আসিয়া তাঁহার যথেষ্ট আদর অভ্যর্থনা করিল, অবিলম্বে তিনি তারকেশ্বর পুরীর একাংশে একটী বাসাবাটী পাইলেন। সকলের নিকট যেন তিনি কতকালের পরিচিতের ন্যায় অভ্যর্থিত ও আপ্যায়িত হইতে লাগিলেন।

অনতিবিলম্বে চতুর্ভুজ শিবশম্ভুর অনাদি লিঙ্গদর্শনে পরম পুলকিত হইলেন, লোমাঞ্চ শরীরে—প্রেমাশ্রু নয়নে তিনি সাতবার শিবমন্দির প্রদক্ষিণ করিয়া পার্শ্ববর্ত্তী পুষ্করিণীতে স্নান করিতে চলিলেন,—নবখনিত জলাশয়ে অবগাহন করিয়া তাঁহার গঙ্গা বলিয়া ভ্রম হইল (*), গঙ্গাসলিলে যেমন জোয়ার ভাঁটা বহিয়া থাকে—চতুর্ভুজ অনুমান করিলেন, সেই পুষ্করিণীতেও সেইরূপ হইতেছে। যাহা হউক অতঃপর তিনি স্নান করিয়া যথাবিহিত রূপে অনাদিলিঙ্গের পূজার্চ্চনা করিলেন, নানা স্তবে, নানা মন্ত্রোচ্চারণে বনভূমি মুখরিত হইয়া উঠিল; ধূপধূনার গন্ধ দিঙ্‌মুখ আমোদিত করিয়া তুলিল, ঢাক ঢোল ও ঘণ্টা মন্দিরার শব্দে অরণ্যানী কম্পিত হইতে লাগিল। চতুর্ভুজ সন্ধ্যারতি সমাপন না করিয়া জল পান করিলেন না; সান্ধ্যোপসনাদি সমাপন পূর্ব্বক দেবায়তনে ঘৃতের প্রদীপ দিয়া তিনি বাসাবাটীতে প্রত্যাগমন করিয়া দেখিলেন, বিবিধ আহার্য্য সামগ্রী তাঁহার জন্য প্রস্তুত রহিয়াছে। নব পুরোহিত দিবসদ্বয়ের উপবাসের পর এই সমস্ত সুখাদ্যসুপেয় পাইয়া পরমাগ্রহে সেগুলি উদরস্থ করিলেন এবং যে মুকুন্দের চেষ্টায় এই সকল সামগ্রী প্রেরিত হইয়াছে তাঁহার ঐশ্বর্য্যমত্তার কথা ভাবিয়া বারংবার তাহাকে ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারিলেন না।

যথাসময়ে রাজা ভারামল্লের নিকট তারকেশ্বরে নবপুরোহিতের আগমন সংবাদ প্রেরিত হইল। রাজা পাত্র মিত্র পুরোহিত সমভিব্যাহারে আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। চতুর্ভুজ উপযুক্ত অবসর বুঝিয়া নৃপতির নিকট একটু বাসস্থানের প্রার্থনা করিলেন। রাজা নিকটবর্ত্তী ভঞ্জপুর গ্রামে তাঁহার বাসভূমি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন, এবং অনেকগুলি জমী জায়গাও তাঁহাকে

* যে সময়ের কথা হইতেছে তখন এই পুষ্করিণী একটী সামান্য পল্বল ছিল। তাহার অনেক দিন পরে রঘুনাথগিরি মোহান্ত হইয়া বর্ত্তমান দুধপুকুর তাহারই উপর খনন করেন। এই সময় মাটী কাটিতে কাটিতে কয়েকটী পাতকুয়া পাওয়া গিয়াছিল, তাহার মধ্যে একটী অস্থিপূর্ণ থাকায় লোকে অনুমান করে পথদস্যুরা নরহত্যা করিয়া ইহার মধ্যে পুতিয়া রাখিত।

চিরদিনের জন্য দান করিলেন। চতুর্ভুজ নবনির্ণীত স্থানে পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ করাইয়া পরমসুখে সপরিজনে অবস্থান করিতে লাগিলেন। বলা বাহুল্য অধিকাংশ সময়ই তাঁহার তারকেশ্বরে কাটিত, রাজানুগ্রহে গঙ্গোপাধ্যায়ের আবশ্যকীয় সামগ্রীর কিছুমাত্র অভাব রহিল না। এইরূপে পরমানন্দে তাঁহার দিবারজনী অতীত হইতে লাগিল। শিবশম্ভু তারকনাথের পূজাদির সামগ্রী নৃপতি ভারামল্ল পূর্ব্ববৎ যোগাইতে লাগিলেন।

তারকেশ্বরাবিষ্কার কাল।

তারকেশ্বর তীর্থের আবিষ্কারকাল নির্ণয় করা বড় দুরূহ ব্যাপার। কারণ তৎসম্বন্ধে কোন লেখা পড়া নাই। একমাত্র সমসাময়িক ঘটনাবলম্বনে তাহার উদ্ভেদ করিতে হইবে। ঘটনা পরম্পরার সামঞ্জস্য রাখিয়া বিচার করিতে যাইলে দেখা যায় যে, যে সময়ে ইংলণ্ডে মৃত মহারাণী ভিক্টোরিয়ার জ্যেষ্ঠতাত ৪র্থ উইলিয়ম রাজত্ব করিতেন, যে সময়ে ইংরাজগণ এদেশে বণিকবেশে অবস্থান করিতেছিলেন এবং যে সময় চন্দন নগরে ফরাসীজাতি, চুচুড়ার ওলন্দাজজাতি অল্পে অল্পে বসতি বিস্তারের প্রয়াস পাইতেছিল—ঠিক সেই সময়েই তারকেশ্বর তীর্থের আবিষ্কার হইয়াছিল। অর্থাৎ তারকেশ্বরধাম খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আবিষ্কৃত।

এইবার হয়ত অনেকে সংস্কৃত তন্ত্র গ্রন্থ সমূহের অতীব পৌরাণিকতা জ্ঞাপন করিয়া প্রশ্ন করিবেন—যদি তাই হয় তাহা হইলে মহালিঙ্গেশ্বর তন্ত্রে তারকেশ্বর শিবের নাম কেমন করিয়া স্থান পাইল—

যথা,—

ঝাড়খণ্ডে বৈদ্যনাথো বক্রেশ্বরস্তথৈবচ।
বীরভূমে সিদ্ধিনাথো রাঢ়েচ তারকেশ্বরঃ॥

যাঁহারা এরূপ আপত্তি তুলিবেন তাঁহাদিগকে আমরা সমূহ প্রমাণ তুলিয়া দেখাইয়া দিব যে উক্ত তন্ত্র গ্রন্থখানি অতীব আধুনিক অর্থাৎ সপ্তদশ শতাব্দীর অনেক পরবর্ত্তী। কেবল এই একখানি নহে তন্ত্র সকলের মধ্যে অনেকগুলি গ্রন্থকে বর্ণনীয় বিষয়ের আধুনিকতা দেখিয়া অতীব নবীন বলিয়া অনুমান করা যায়।

যে সময়ে ভারতে ইংরাজগণ বাণিজ্য ব্যপদেশে অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সময় এদেশে অনেকগুলি ক্ষুদ্র রাজার অভ্যুদয় হইয়াছিল। শোভাসিংহ ইহাদিগের অন্যতম। এই পরাক্রান্ত হিন্দুরাজা জাতিতে উত্তর-পশ্চিম-প্রদেশীয় ছত্রী ছিলেন। বৰ্দ্ধমান রাজার অধীন চেতুয়া ও বরদা পরগণায় ইনি আধিপত্য করিতেন। তদানীন্তনকালে বঙ্গদেশের সকল রাজা জমীদারই বৰ্দ্ধমানরাজের অধীন ছিলেন, বৰ্দ্ধমানের রাজা আবার মুর্শিদাবাদের নবাবের অধীনতায় কাল যাপন করিতেন। বলদৃপ্ত শোভাসিংহ "রোহিম" খাঁ নামক একজন পাঠান দলপতির সহিত মিলিত হইয়া অনেক রাজা জমীদারকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন; এমন কি বৰ্দ্ধমানের রাজা কৃষ্ণরামকেই পরাজিত ও নিহত করিয়া নৃশংসতার একশেষ প্রদর্শন করেন। ইংরাজ বণিকগণ এই হিন্দু নরপতির অত্যাচার হইতে নিরুপদ্রবে থাকিবার জন্য কলিকাতায় একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করিবার প্রয়াস পান, মুর্শিদাবাদের তাৎকালিক নবাব তাঁহাদিগের প্রস্তাব অনুমোদিত করিলে তাঁহারা বর্ত্তমান কলিকাতার উপকণ্ঠে একটী দুর্গ (ফোর্ট উইলিয়ম) নির্ম্মাণ করিয়া আপনাদিগের ধনসম্পত্তি নিরাপদে রাখিবার প্রয়াস পান। বলীয়ান শোভাসিংহ ১৬৯৬ খৃষ্টাব্দে বৰ্দ্ধমান রাজকুমারীর হস্তে নিহিত হয়েন, সেই রাজতনয়া অলৌকিক রূপলাবণ্যবতী ছিলেন, 'শোভা' তাঁহার শোভায় বিমুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে হস্তগত করিবার চেষ্টা করিলে রাজপুত্রী সম্মতিজ্ঞাপন-পূর্ব্বক তাঁহাকে আপন কক্ষে লইয়া যান এবং অস্ত্রাঘাতে তদীয় পাশবিক প্রবৃত্তির সমুচিত পুরস্কার প্রদান করেন।

এই শোভাসিংহ রাজা বিষ্ণুদাস ও ভারামল্লের সহিত, এক জাতীয় বলিয়া কোন বিবাদ বিসম্বাদ করেন নাই বরং যাহাতে তাঁহাদিগের মধ্যে আহার ব্যবহার ও কন্যা-পুত্রাদির আদান প্রদান চলে তাহার জন্য সমুহ চেষ্টিত হইয়াছিলেন, রাজা বিষ্ণুদাস কৌশলে তাঁহাকে আশ্বস্ত করিয়া কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া লইতেন, কারণ তিনি জানিতেন শোভাসিংহের সঙ্গে বিবাদ করিয়া থাকা নিরাপদ নহে, অপিচ তাঁহার ন্যায় অনাচারীর সহিত ভোজনাদি সম্বন্ধও চলিতে পারে না। এই সকল ঘটনা দ্বারা বেশ বুঝা যাইতেছে তারকেশ্বরাধিপতি রাও ভারামল্ল ও রাজা বিষ্ণুদাস শোভাসিংহের সমসাময়িক লোক—অর্থাৎ ১৬২৭ খৃষ্টাব্দের সমকালীন। ১৬২৭ খৃষ্টাব্দের সমসময়ে যাঁহাদিগের বলবীর্য্য

প্রদীপ্ত হইয়াছিল—তাঁহারা তখন যে মধ্য-বয়স্ক ছিলেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এই সকল কারণে বুঝা যাইতেছে রাও ভারামল্ল কর্ত্তৃক তীর্থাধিকার ১৬২৭ খৃষ্টাব্দের ২।৫ বৎসর পরে হইয়াছিল।

'ধর্ম্মমঙ্গল'গ্রন্থপ্রণেতা সহদেব চক্রবর্ত্তী স্বীয় ধর্ম্মমঙ্গল গ্রন্থে লিখিয়া গিয়াছেন—

মনে হয় মৃত্যুঞ্জয় একচল্লিশ সালে,
বৃষধ্বজ বসেছিল শ্রীফলের মূলে।

তারকেশ্বর তীর্থের আদিম অবস্থা, শিবলিঙ্গের উৎপত্তি বিবরণ প্রভৃতি বর্ণনা করিয়া সহদেব এই ৪১ সালের উল্লেখ করিয়াছেন বলিয়া তাহাই তারকেশ্বরাবিষ্কারের প্রকৃত কাল বলিয়া ধরিয়া লইতে আমরা ন্যায়ানুসারে বাধ্য।

কবির কথায় কেবলমাত্র ৪১ সাল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ইহা তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী কোন শত পূর্ব্ব ৪১ সাল; সন্দেহ নাই। সহদেবের ধর্ম্মমঙ্গল ১১৪১ বঙ্গাব্দে বিরচিত হয়, ইহার প্রমাণ অনেক আছে, সুতরাং বুঝিতে হইবে তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী যে ৪১ সাল (অর্থাৎ ১০৪১ সাল) গিয়াছে তাহাই তারকেশ্বর তীর্থাবির্ভাবের প্রকৃতকাল। সেই ১০৪১ সাল (১৬৩৪ খৃষ্টাব্দ) রাজা বিষ্ণুদাস ও ভারামল্লের সমসাময়িক। তাহা হইলে তারকেশ্বর তীর্থ বর্ত্তমান সময় (১৩১৫—১০৪১ সাল)=২৭৪ বৎসর পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়াছে, এরূপ স্থির করা অন্যায় নহে। প্রাগুক্ত মহালিঙ্গেশ্বর তন্ত্র যে এই ১০৪১ সালের বহুপরবর্ত্তী তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই।

মোহান্ত শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র গিরিকে ছাড়িয়া দিলে—তৎপূর্ব্ববর্ত্তী কাল পর্য্যন্ত (১১) জন মোহান্ত তারকেশ্বরের মঠাধ্যক্ষতা করিয়া গিয়াছেন বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়। অন্যদিকে তারকেশ্বরাবিষ্কারক রাজা ভারামল্লের ভ্রাতৃবংশ-তালিকা অনুসন্ধান করিলেও বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত ১০ পুরুষ হইয়াছে বলিয়া দেখা যায়। সুতরাং বুঝা যাইতেছে ১৩১৫ সাল হইতে ২৭৪ বৎসর পূর্ব্বে এই অভিনব তীর্থের আবিষ্কার হওয়াই সম্ভবপর। সহদেব চক্রবর্ত্তীর কথায় বুঝা যাইতেছে যে তারকেশ্বর তীর্থ ১১৪১ সালের পরবর্ত্তী নহে, কারণ তাহা হইলে

* কেহ কেহ বলেন—এই ৪১ সাল সহদেবের গ্রন্থ রচনার কাল ১১৪১ সাল। এই বর্ষে বিল্ববৃক্ষের তলায় উপবিষ্ট শিবের সহিত কবির সাক্ষাৎ হইয়াছিল। "ধর্ম্মমঙ্গলে তিনি তাহাই ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। যদি তাই হয় তাহা হইলে তারকেশ্বরের আদিম অবস্থার বর্ণনা করিয়া তিনি কেন ৪১ সালের উল্লেখ করিলেন তাহার সদুত্তর কে দিবে?

তদীয় গ্রন্থে তাহার উল্লেখ থাকিতে পারিত না। সহদেবের প্রাগুক্ত কবিবাক্যানুসারে ৪১ সাল ধরিতে হইলে ১০৪১ সালই (১৬৩৪ খৃঃ) ধরিতে হয়,যেহেতু প্রথম-পরিত্যাগে প্রমাণ নাই *। অপিচ, যদি তাহারও পূর্ব্ববর্ত্তী—যে কোন ৪১ সাল অর্থাৎ ৯৪১ সাল বা ৮৪১ সাল হইত তাহা হইলে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম ভট্টাচার্য্যের চণ্ডীগ্রন্থে তারকেশ্বর তীর্থের বা তারকনাথ শিবের উল্লেখ থাকিত। † কবিকঙ্কণ খৃষ্টীয় ১৭ দশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বা সন ১০০০ সালাত্যয়ের কিয়দ্দিন মাত্র পরে চণ্ডীকাব্য রচনা করেন তাহা বিশিষ্টরূপে প্রমাণিত হইয়াছে। অতএব সর্ব্বপ্রকারে মীমাংসিত হইতেছে যে চণ্ডী রচনাকালের (সন ১০০০ সালের প্রারম্ভের) পরবর্ত্তী এবং সহদেব চক্রবর্ত্তীর ধর্ম্মমঙ্গল গ্রন্থ রচনাকালের (১১৪১ সালের) পূর্ব্ববর্ত্তী যে ৪১ সাল, তাহাই তারকেশ্বর-তীর্থাবিষ্কারের বৎসর, ১০৪১ সাল বা ১৬৩৪ খৃষ্টাব্দ ভিন্ন তাহা আর কোন বৎসর হইতে পারে না।

---

* প্রথম-পরিত্যাগে প্রমাণাভাবঃ ইতি ন্যায়াৎ।

† মুকুন্দরাম স্বীয় চণ্ডীকাব্যে বঙ্গের অনেক দেব দেবীর স্তব-বন্দনাদি করিয়াছেন; তাঁহার সময়ে তারকেশ্বর শিবের আবিষ্কার হইয়া থাকিলে অবশ্যই তিনি তাঁহার স্তব-বন্দনাদি করিতে ছাড়িতেন না।

* প্রসিদ্ধ পরিব্রাজক শ্রীযুক্ত ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী সন ১৩১৪ সালের ২৩শে বৈশাখের স্বদেশ সাপ্তাহিক পত্রে লিখিয়াগিয়াছেন ৯২৬ সালে বাবা ত্রিকুটস্বামী তারকেশ্বরের বনে তাঁহার পর্ণ-কুটীর আশ্রমে বাস করিতেন। * *

ত্রিকুটস্বামী ঐ বনে সম্ভবতঃ ৯২৬ সাল হইতে ৯৩৯ সাল পর্য্যন্ত অবস্থান করিয়াছিলেন। তাঁহার তিরোভাবের বহু পরবর্ত্তী কাল পর্য্যন্ত ঐ স্থান জঙ্গলরূপেই পরিগণিত ছিল এবং লোক সমাগম রহিত ছিল। প্রায় শতাব্দীকাল পর্য্যন্ত কেহ ঐ সাধুর কথা স্মরণ করে নাই। এই সুদীর্ঘ সময়ের পরে মুকুন্দ ঘোষ সম্বন্ধীয় ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছিল।

পরিব্রাজকের এই উক্তিতে বেশ বুঝা যাইতেছে তারকেশ্বর তীর্থ ৯৪১ সালের পরবর্ত্তী আর সহদেব চক্রবর্ত্তীর ধর্ম্ম মঙ্গলের লেখা হইতে জানা যাইতেছে—উহা ১১৪১ সালের পূর্ব্ববর্ত্তী কোন ৪১ সালে আবিষ্কৃত। সুতরাং এই ৪১ সাল ১০৪১ সাল না হওয়া কোনক্রমেই সঙ্গত নহে। ফরাসী পরিব্রাজক মুশোলাদাঁৎ সাহেব যে ভারতে আসিয়া তারকেশ্বরের প্রাচীন বনে তারকনাথ শিব দেখিয়াছিলেন, তাহা ঐ ১০৪১ সালের সম সাময়িক হওয়াই সঙ্গত। ত্রিকুটের সময়ে হওয়া সম্ভাবিত নহে। কারণ তাহা হইলে তাঁহার তারকেশ্বর শিবলিঙ্গ দর্শন প্রায় ৪০০ বৎসরের পূর্ব্বে যাইয়া পড়ে। কিন্তু ইহা বেশ মীমাংসিত হইতে পারে যে তিনি প্রায় ৩০০ বৎসরের পূর্ব্বে ভারতে আসিয়াছিলেন।

মোহান্ত ও তদীয় কর্ত্তব্য।

যে বৎসর তারকেশ্বর তীর্থের আবিষ্কার হয়, তাহার অত্যল্পকাল পরেই চতুর্ভুজ গঙ্গোপাধ্যায় তারকেশ্বর ধামে আসিয়া তত্রত্য শিবলিঙ্গের পৌরহিত্য স্বীকার করেন। পুরোহিত নিয়োগের আবার কিছুদিন পরেই তারকনাথ তীর্থে নব মোহান্তাবির্ভাবের সুযোগ উপস্থিত হয়।

সহসা একদিন দেখা গেল—একজন পরিব্রাজক সন্ন্যাসী তারকেশ্বরধামে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। ইহাঁর নাম পরমহংস "জগন্নাথ গিরি"। সন্ন্যাসী অভিনব তীর্থে আসিয়া মনের সাধে দেবাদিদেব মহাদেবের পূজারাধনা করিলেন, তাঁহার ইচ্ছা হইল না যে আর এই শান্তিময় স্থান ছাড়িয়া যান; কিন্তু পূর্ব্ব হইতেই সন্ন্যাসী মহাশয় সঙ্কল্প করিয়াছিলেন যে একবার চন্দ্রনাথ তীর্থ পর্য্যটন করিয়া আসিবেন, এই তীর্থ পরিভ্রমণ করিলেই তাঁহার সমুদায় শৈবতীর্থ ভ্রমণ শেষ হইত, অতএব জগন্নাথ তারকনাথদেবের পূজারাধনা করিয়া সত্বর চন্দ্রনাথ গমনোদ্দেশে যাত্রা করিলেন।

কিয়দ্দূর গমনের পর প্রখর মার্ত্তণ্ডকরে সন্ন্যাসীর শরীর অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িল, তখন তিনি প্রান্তর-মধ্যস্থিত একটী বটবৃক্ষের তলায় গিয়া উপবিষ্ট হইলেন, কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামের পর একজন ব্রাহ্মণ তাঁহার নিকট আসিয়া উপস্থিত। ব্রাহ্মণ উপযাচক হইয়া জগন্নাথের সহিত কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিলেন।

অনেক কথোপকথনের পর ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসীকে তারকনাথতীর্থ ছাড়িয়া যাইতে নিষেধ করিয়া অনেক সদুপদেশ অর্পণ করিলেন। জগন্নাথের দিব্য-জ্ঞানোদয় হইল, তিনি আরও কিছু তত্ত্বোপদেশ সংগ্রহের অভিলাষী হইলে, ব্রাহ্মণ জানাইলেন আজ আর নহে, আগামী বৈশাখী পূর্ণিমায় তুমি এই স্থানে আসিলে আবার আমার দেখা পাইবে। বলা আবশ্যক ইহা ছাড়া আমার আরও অনেক বক্তব্য আছে।

অতঃপর উভয়েই স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। জগন্নাথ গিরিকে পুনর্ব্বার তারকেশ্বরধামে ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া মুকুন্দলাল ঘোষ জিজ্ঞাসা করিল—

কেন ফিরে এলে পুনর্ব্বার।
কি তব মনন আছে, স্বরূপ আমার কাছে,
কহ শুনি সত্য সমাচার॥ (তারকমঙ্গল)

সন্ন্যাসী অবশ্য মুকুন্দের জিজ্ঞাসার যথাযোগ্য প্রত্যুত্তর দিতে নিরস্ত হইলেন না, জগন্নাথের পুনরাগমন বৃত্তান্ত গোপনন্দন অবিলম্বে গিয়া পুরোহিতের গোচর করিল। তিনি তাঁহাকে বিশিষ্ট সমাদরে তারকেশ্বরে রাখিবার জন্য মুকুন্দকে অনুরোধ করিলেন, এবং অবিলম্বে গিয়া সন্ন্যাসীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন ;—যথাবিহিত অভিবাদনাদি নিষ্পন্ন হইলে তিনি জগন্নাথকে তারকেশ্বরধামে থাকিবার সানুনয় অনুরোধ জ্ঞাপন করিলেন।

"জগন্নাথ" অবশ্যই ইহাঁদিগের প্রার্থনায় অস্বীকৃত হইলেন না, অবিলম্বে রাজা ভারামল্লের নিকট মোহান্তাগমন সংবাদ প্রেরিত হইল, রাজা দিন দিন তারকেশ্বর-শিবের সেবার্চ্চনার সুব্যবস্থা, তারকেশ্বর-সম্পত্তি-রক্ষার সদুপায় হইতেছে দেখিয়া যথেষ্ট আনন্দিত হইতে লাগিলেন, ইহার পর রাজা জগন্নাথের সহিত আসিয়া সাক্ষাৎ করিলেন,ও তাঁহাকে আজীবন তারকেশ্বর মঠের অধ্যক্ষরূপে বিরাজিত থাকিতে হইবে বলিয়া অনুরোধ করিলেন, নবীন মোহান্ত তাহা সম্মানের সহিত অনুমোদন করিয়া লইতে বিরত হইলেন না।

এইরূপে সপ্ত দিবস অতীত হইল। অষ্টম দিবসে সন্ন্যাসী জগন্নাথগিরি সেই প্রান্তর মধ্যস্থিত বটবৃক্ষের তলায় ২য় প্রহর রাত্রিতে গিয়া উপস্থিত হইলেন, এই দিন বৈশাখী পূর্ণিমা। অল্পক্ষণ পরে সেই ব্রাহ্মণ আসিয়া উপস্থিত। জগন্নাথ ইষ্টদেব জ্ঞানে তাঁহাকে বারংবার প্রণতি স্তুতি জ্ঞাপন করিলেন। ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসীর প্রতি সদয় হইয়া বলিতে লাগিলেন,—তারকেশ্বরে থাকিবার সম্বন্ধে গুটিকত সদুপদেশ আমি তোমায় অর্পণ করিব, তুমি তদনুসারে কার্য্য করিলে অনন্তমঙ্গল লাভে অধিকারী হইবে—

(১) পূজার নিয়ম—প্রাতঃকালে মঙ্গলারতির পর সামান্যাকারে পূজা করিয়া মধ্যাহ্নে মহাপূজার আয়োজন করিবে। যে গাভীর দুগ্ধে কানন নিপতিত শিবশিলা প্রতিদিন সিক্ত হইয়াছে তাহার বা তদীয় পুত্রী পৌত্র্যাদির দুগ্ধে পরমান্ন পাক করিয়া মধ্যাহ্নে ভোগ দিতে হইবে, সন্ধ্যায় বিবিধ মিষ্টান্নে শীতল দিবে; সায়ং প্রাতঃ মধ্যাহ্ন—ত্রিকালে আরতির অনুষ্ঠান করিবে। মাধ্যাহ্নিক পূজাভোগের পর পর্য্যঙ্কে দিব্য শয্যা করাইয়া দেবাদিদেবের শয়নার্থ অর্পণ করিবে। দুইবেলা তামাকু সাজিয়া হুঁকা শটকা সহিত লিঙ্গসমীপে স্থাপন করিতে বিস্মিত হইবে না।

(২) বৃষপূজন—বলীবর্দ্দ শঙ্করের অতি প্রিয়তম পশু, অতএব লিঙ্গের সম্মুখভাগে প্রস্তর নির্ম্মিত বলীবর্দ্দমূর্ত্তি স্থাপন করাইয়া প্রত্যহ পূজা করাইবে, তারকেশ্বরধামে যেন গো বলীবর্দ্দের কোনরূপ অসম্মাননা না হয়।

(৩) মোহান্তের সমাধি—গোপতনয় মুকুন্দের দেহ নাশ হইলে মন্দিরের পূর্ব্বাংশে সমাধি দিয়া রাখিবে, মোহান্তগণের দাহ সংস্কার কদাচ হইবে না; এক একটি মোহান্ত মৃত হইলে শিবত্ব প্রাপ্ত হইবে, অতএব মন্দিরের নিকট তাহাদের সমাধি করাইয়া তদুপরি শিব-স্থাপনা করিতে পারিলে ভাল হয়।

(৪) শিবসন্ন্যাস—চৈত্র মাসে রাজধানী রামনগরবাসী গোপ-বংশীয়গণ শিবসন্ন্যাস করিবে; সদাচারে আতপান্ন খাইয়া তাহারা একমাসকাল যাপন করিতে থাকিবে। শিবসেবার জন্য তারকেশ্বরধামে তাহারা যে সকল কার্য্যের আচরণ করিবে তাহা কদাচ প্রতিহত না হয়।

(৫) জিতেন্দ্রিয়তা—তারকেশ্বর তীর্থে অনেকানেক সতীসাধ্বী কুলাঙ্গনা যাতায়াত করিবেন। অতএব মোহান্তের সর্ব্বদা জিতেন্দ্রিয় হওয়া কর্ত্তব্য। অকৃতদার, জিতেন্দ্রিয়, বিলাসবর্জ্জিত, সংসারবিরক্ত, ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমী, নির্লোভ ব্যক্তিই মোহান্ত হইবার যোগ্য।

(৬) শিষ্য বা চেলা—মানবদেহ চিরবিনশ্বর, অতএব মোহান্তগণ এক বা একাধিক চেলা বা শিষ্য করিতে পারিবেন। ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমী, লোভবিহীন, মিষ্টভাষী, ইন্দ্রিয়াশক্তিহীন দেব-দ্বিজ-ভক্ত ব্যক্তিই চেলা হইবার উপযুক্ত। প্রধান চেলাই মঠাধ্যক্ষতা পাইবার অধিকারী হইবে। অন্য সকলে গ্রাসাচ্ছাদন মাত্রের অধিকারী হইয়া তারকেশ্বরের তত্ত্বাবধান করিবে।

(৭) মোহান্তের দৈনন্দিন কর্ত্তব্য—মোহান্ত প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করিয়া কটি দেশে ঘণ্টা বাঁধিয়া "শম্ভো জাগৃহি" (শম্ভো জাগ) শব্দে তারকনাথ শিবকে জাগরিত করিবে। পুরীর মধ্যে তাহাকে সমস্ত দিন যাপন করিতে হইবে, সমাগত সমুদায় অতিথি সজ্জন ভোজন করাইয়া যাহা কিছু শঙ্করের পূজাবশিষ্ট সামগ্রী বর্ত্তমান থাকিবে তাহাই তাহার আহার্য্য। রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরে গুরূপদিষ্ট যোগাদির আরাধনা করিয়া তদন্তে নিদ্রা যাওয়াই তাহার কর্ত্তব্য।

(৮) সাধারণী পূজা—যে কেহ পূজার্থ আগমন করিলে তাহাকে বিনাপত্তিতে পূজা করিতে দিবে, কেহ কোন প্রকার মানসিক করিলে কেশ

শ্মশ্রু ও নখাদিধারণ পূর্ব্বক শঙ্করস্মরণে ও শিলানামোচ্চারণে সংযতভাবে অভীষ্ট সিদ্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত যাপন করিবে, এবং মনোবাসনা পূর্ণ হইলে সে তারকেশ্বরে আসিয়া শ্মশ্রুকেশাদি মুণ্ডন করিবে, অনুমতি স্বরূপ মোহান্ত তাহার কপালে মৃত্তিকার ফোঁটা দিবেন। আচণ্ডাল ব্রাহ্মণের পূজার অধিকার থাকিবে।

(৯) হত্যা বা ধন্নার নিয়ম—তারকনাথের শরণাগত হইয়া তৎ-প্রীতি উৎপাদন মানসে তদীয় সম্মুখে অনবরত বর্ত্তমান থাকার নাম "হত্যা বা ধন্না।" কাস, কুষ্ঠ, প্রভৃতি রোগও শিবপ্রসাদে অপনোদিত হইতে পারে, অতএব হত্যা দেওয়া একটী পরমৌষধ। শুদ্ধচিত্ত হইয়া রুক্ষ স্নান করিয়া স্নানান্তে পূজাদি দিয়া শিবসম্মুখে কালাতিপাত করাকেই হত্যা কহে। হত্যা, দানার্থীগণ যেন ত্রিসন্ধ্যায় মন্দির-প্রদক্ষিণ, শিব প্রণাম ও শঙ্করনামোচ্চারণ করিতে বিস্মৃত না হয়। উপবাস করিয়া থাকাই প্রকৃত নিয়ম। তবে যে তাহাতে অসমর্থ হইবে সে মাত্র তারকনাথের চরণামৃত পান করিতে পারিবে, অসমর্থ স্থলে একের জন্য অপরেও হত্যা বা ধন্না দিতে পারে। *

ব্রাহ্মণবেশী শঙ্কর সহজ কথায় গোটা কতক কর্ত্তব্য কর্ম্মের উপদেশ দিয়া এইবার যোগমার্গের বিশিষ্ট তত্ত্বোপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন, বলা বাহুল্য জগন্নাথ গিরি তাহা গুরূপদেশ জ্ঞানে হৃদয়ঙ্গম করিয়া লইতে বিরত হইলেন না।

যাবতীয় কথোপকথনে রাত্রি অতিবাহিত হইয়া গেল। জগন্নাথ স্নান শৌচাদি সমাপন করিয়া মহানন্দে শঙ্করার্চ্চনা সমাপন করিলেন এবং পূর্ব্ব প্রাপ্ত উপদেশ মত মোহান্তের বেশে মন্দির সমীপস্থ সজ্জিত শয্যায় (গোদিতে) আসিয়া উপবেশন করিলেন। তখন সকলেই জানিল ভোলানাথ জগন্নাথকে চেলা করিয়াছেন। রাজা অবিলম্বে এই সংবাদ পাইয়া পরম পরিতুষ্ট হইলেন।

কিছুদিন এইপ্রকার যাইতে লাগিল। মোহান্ত জগন্নাথ শিব প্রদত্ত উপদেশ ক্ষণকালের জন্যও বিস্মৃত হইলেন না; দলে দলে লোক আসিয়া তাঁহার শুভ সন্দর্শন-লাভে কৃতার্থ হইতে লাগিল, এমন কি পাদ পূজাদি করিতেও বিরত হইল না। মোহান্ত জিতেন্দ্রিয় যোগনিষ্ঠ হইলে তাঁহার মর্য্যাদা অবশ্যই হইয়া থাকে।

ক্রমে তারকেশ্বর ধাম দোকান প্রসারে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল, রাজা ভারামল্ল

* ১২০৮ সালে এই হত্যা পদ্ধতি কার্য্যে পরিণত হয়।

প্রতিদিন আসিয়া বাবা তারকেশ্বরের পূজা করিয়া যাইতেন। তদীয় ভৃত্যবর্গের কর্ম্মনিষ্ঠতায়, চতুর্ভুজের পৌরহিত্যে মুকুন্দ ঘোষের পর্য্যবেক্ষণে আর জগন্নাথ গিরির কর্ত্তৃত্বে তারকনাথ দেবের সেবারাধনা বেশ চলিতে লাগিল, নানা দেশ হইতে লোক জন আসিয়া তারকনাথ দেবের পূজা দিতে আরম্ভ করিল; কুষ্ঠ প্রভৃতি মহারোগাক্রান্ত ব্যক্তিবর্গও শ্রীপুরীতে ধন্না দিয়া অভীষ্ট ঔষধ লাভ করিতে লাগিল। ক্রমে তারকনাথ-মাহাত্ম্য দেশ বিদেশে প্রচারিত হইয়া পড়িল। সুতরাং তারকনাথ দেবের ভাণ্ডার গৃহ নানা শস্য সম্পত্তিতে নানা দ্রব্য সম্ভারে, এবং অমেয় ধন রত্নে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

জগন্নাথগিরি এইবার একটী মোহান্তাবাস নির্ম্মাণের আয়োজন করিলেন, রাজা ভারামল্লের নিকট এই প্রস্তাব উপস্থাপিত হইলে তিনি তাহাতে কিছুমাত্র আপত্তি করিলেন না। তখন যৎসামান্য ব্যয়ে একটী সামান্য রকমের আবাস বাটী বিনির্ম্মিত হইল।

মুকুন্দ ভাবিল আর কেন, এইবার ইহধাম ছাড়িয়া যাওয়া কর্ত্তব্য। দেবাদিদেব শিবশম্ভুর সেবার্চ্চনার সকল ব্যবস্থা ঠিক হইয়াছে সুতরাং আমারও সকল সাধ মিটিয়া গিয়াছে। অতএব আর বাঁচিয়া থাকিবার প্রয়োজন নাই! জীবন ত্যাগের ইহাই উপযুক্ত অবসর।

মানুষ দুই রকমে মরিতে চাহে। অতীব দুঃখে পড়িলে তাহাদের মরিবার সাধ হয়, আর অত্যন্ত সুখের অভ্যুদয়ে তাহারা মরিতে বাসনা করে।

যাহারা সুখোদ্রেককালে জীবনত্যাগের প্রয়াস পায় তাহারা বড় বিবেকী! তাহাদিগের ধারণা—সুখের পর দুঃখের আবির্ভাব যখন অবশ্যম্ভাবী তখন দুঃখের মুখ না দেখিয়া সুখের সময়েই চিরবিদায় লইয়া যাওয়া মতিমানের কার্য্য।

পরম পুণ্যাত্মা মুকুন্দলাল ঘোষ তাহার পরমারাধ্য শিবশম্ভু তারকনাথ বাবার সম্মুখে থাকিয়া পরমানন্দে চিরবিদায় গ্রহণ করিল! মৃত্যুর পূর্ব্বে তাহার মুখে কোন প্রকার ভয় বা কাতরতার লক্ষণ প্রকাশ পায় নাই। তাদৃশ পীড়ার তাড়নাও তাহাকে সহ্য করিতে হয় নাই। ধন্য মুকুন্দলাল, তোমারই জন্ম সার্থক—নচেৎ কলিতে ইচ্ছামৃত্যু কাহার ভাগ্যে ঘটে; শঙ্কর-সাক্ষাৎকারই বা কয়জনে লাভ করিতে পারে?

মুকুন্দের মৃত্যুসংবাদ তাহার সাহাপুরের বাটীতে পহুঁছিলে হাহাকার পড়িয়া

গেল। তদীয় আত্মীয় স্বজন ব্যথিত চিত্তে অবিলম্বে তারকেশ্বর ধামে আসিয়া উপস্থিত হইল। সকলেই আসিয়া দেখিল মুকুন্দের শরীর কিছুমাত্র বিকল বিশীর্ণ বা বিবর্ণ হয় নাই। বৃন্তচ্যুত প্রাভাতিক কুসুমের ন্যায় মুকুন্দ যেন ধরিত্রী-ক্রোড়ে পড়িয়া হাসিতেছে।

জগন্নাথ * গিরি মহাসমারোহে মুকুন্দের শবদেহের সমাধির ব্যবস্থা করিলেন, রাজা ভারামল্ল আসিয়া সে শোকোৎসবে যোগ দিলেন; মোহান্তের চেলাগণ সেই শবদেহ পরমসাদরে মন্দিরের পূর্ব্বদিকে মৃৎপ্রোথিত করিল †
রাজা কিন্তু মুকুন্দের শোকে বড় কাতর হইলেন, একটা পুণ্যাত্মা লোকের আবির্ভাবে যত আনন্দ, তাহার বিলয়ে আবার ততোধিক দুঃখ। জগতের ইহাই নিয়ম।

কালনির্ণয়ে ভুলভ্রান্তি।

মহামতি লেপ্টেনাণ্ট কর্ণেল ক্রফোর্ড সাহেব হুগলী জেলার সংক্ষিপ্ত ইতিহাসে লিখিয়াছেন খৃষ্টীয় ১৮শ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে অযোধ্যা প্রদেশের "মহবাগড় কালিঙ্গড়" নামক স্থানে বিষ্ণুদাস নামে এক ক্ষত্রিয় রাজা বাস করিতেন। অযোধ্যার নবাবদিগের কর্ত্তৃত্বে বিরক্ত হইয়া বাঙ্গালা দেশে আসিয়া হরিপালের নিকটবর্ত্তী রামনগর গ্রামে তিনি বাস করেন। তাঁহার সহিত ৫০০ ক্ষত্রিয় ও ১০০ কণোজী ব্রাহ্মণ আসিয়াছিল। এ-দেশে আসিয়া বিষ্ণুদাস মুরশিদাবাদের নবাব সরকারে ধৃত হয়েন, কিন্তু অগ্নি পরীক্ষা দিয়া অব্যাহতিলাভ করেন। (পূর্ব্বে দ্রষ্টব্য) অধিকন্তু তারকেশ্বরের ৮ মাইল দূরে ৫০০ বিঘা জমী নিষ্কর জাইগীর (বর্ত্তমান ১৫০০ বিঘা) প্রাপ্ত হয়েন।

ক্রফোর্ড সাহেবের এই লেখার উপর বিশ্বাস করিতে হইলে বলিতে হয় বিষ্ণুদাস ও তাঁহার সহোদর পিতার সহিত এদেশে আসেন নাই। কিম্বদন্তী কিন্তু তাহা বলে না। [তারকেশ্বরতথ্য ৯ পৃঃ দেখ]।

---

* এম্প্রেস্ পত্রিকায় এই মোহান্ত জগন্নাথগিরিকেই ন্যায়গিরি চক্রপণ নামে অভিহিত করা হইয়াছে। (Empress,—May, 1908).

† এই সমাধি বাঁধাইয়া উত্তরকালে ইহার উপর একখানি শিলা স্থাপন করা হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে যে প্রস্তর পরিলক্ষিত হয়, তাহা সেই স্থাপিত শিলা মাত্র; বাস্তবিকপক্ষে মুকুন্দের মৃত দেহ যে পাষাণ হইয়া এই শিলার উৎপত্তি করিয়াছে এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

১৮৮৯ খৃঃ অব্দের অক্টোবর মাসের একখণ্ড "কলিকাতা রিভিউ" নামক ইংরাজী সাময়িক পত্রে একজন লেখক লিখিয়াছেন—বঙ্গীয় ৭৮৫ সালে অর্থাৎ প্রায় ৫৩০ বৎসর পূর্ব্বে রামনগর গ্রামে বিষ্ণুদাস নামে একজন রাজা বাস করিতেন—

"About 785 of the Bengali era, or about 530 years ago, Raja Bahvamala lived at the village of Ramnagar.

এই ভবমল্ল (আমাদের লিখিত ভারামল্ল)কেই আবার তারকেশ্বর তীর্থের আবিষ্কারক বলিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে। সুতরাং লেখকের মতে তারকেশ্বর তীর্থ ৭৮৫ সালের সমসাময়িক। তাহা হইলে তারকেশ্বর তীর্থ খৃষ্টীয় ১৪শ শতাব্দীর শেষ পাদবর্ত্তী হইয়া পড়ে।

কলিকাতা রিভিউএর এই মত যে সম্পূর্ণ অমূলক তাহাতে সন্দেহ নাই। সমূলক হইলে চণ্ডীকাব্যে (কবিকঙ্কণ কৃত) সে তীর্থের উল্লেখ থাকিত; অপিচ, ক্রফোর্ড সাহেবের মতের সঙ্গেও অমিল হইত না। আমরা প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে তারকেশ্বর তীর্থ ১৬৩৪ খৃষ্টাব্দের সমসাময়িক। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দের মে মাসের এম্‌প্রেশ মাসিকপত্রে • লিখিত হইয়াছে—ভারামল্ল নামে একজন ক্ষত্রিয় ছিলেন, উজ্জয়িনীর কুলজাতীয় কোন রাজপুতবংশে ইহাঁর জন্ম। ইনি হুমায়ুনের বেতনভোগী একদল ফৌজ লইয়া বেরার হইতে আগমন করেন। ১৫৩৯ খৃষ্টাব্দে সের খাঁর সহিত যুদ্ধে হুমায়ুনের পরাজয় হইলে ভারামল্লের অধীনস্থ সেনাদল ভাঙ্গিয়া যায় ও সৈন্যগণ বর্দ্ধমান বীরভূম বাঁকুড়া হুগলী হাওড়া মেদনীপুর প্রভৃতি জেলায় বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে॥"

লেখকের একথায় বিশ্বাস করা সমীচীন নহে। কারণ নানাপ্রমাণ পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা দেখাগিয়াছে যে ভারামল্ল খৃষ্টিয় সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রামনগরে বর্ত্তমান ছিলেন। সুতরাং তিনি যে ১৫৩৯ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গলায় আসেন ইহা কিরূপে বিশ্বাস্য হইতে পারে? তাহা হইলে বঙ্গাগমনকালে তাঁহার বয়স ১০০শত বৎসরের ও অধিক হইয়া পড়ে। পক্ষান্তরে ভারামল্লের পিতাই যে এদেশে আসিয়া প্রথম বাস করেন, তাহারও প্রমাণ আছে; সে আগমন যে ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দের পরবর্ত্তী তাহাতে সন্দেহ নাই। রাজা বিষ্ণুদাস ও ভারামল্ল যখন রামনগরে বিরাজ করিতেছিলেন, তখন আগ্রার সিংহাসনে মোগল রাজকুমার আরঙ্গজীব অধিষ্ঠিত। ১৬৩৪খৃঃ বা ১০৪১ সাল তারকেশ্বরাবিষ্কারের

কাল ধরিতে হইলে বলিতে হয় ইংলণ্ডের রাজা ১ম চার্লসের আমলে অবরুদ্ধ সম্রাট সাজাহানের সময় এবং বাঙ্গালার নবাব আজিম খাঁর (১৬৩২—১৬৩৭ খৃষ্টাব্দ মধ্যে) অধিকার কালে তারকেশ্বর আবিস্কৃত হয়।

এতদ্ব্যতীত তারকেশ্বরতীর্থাবিষ্কারকালনির্ণয়ে আরও অনেক ভ্রমপ্রমাদ আছে তাহা অনুল্লেখ্য।

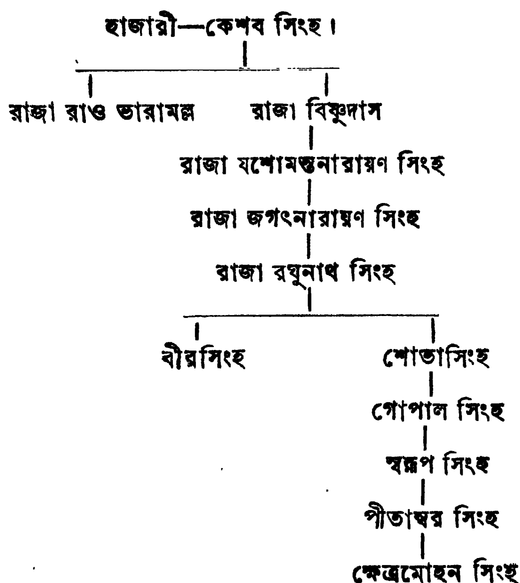
কেশবহাজারীর বংশ।

নশ্বর জগতে জীবজন্তুগণ জলবুদ্‌বুদের ন্যায় ক্ষণকালের জন্য অবভাসমান থাকে; আবার ক্ষণকাল পরে তাহারা কোথায় বিলীন হইয়া যায়। যে মুকুন্দের পুণ্যবত্তায় তারকেশ্বরতীর্থের আবিষ্কার; সে মুকুন্দ ঘোষ ইতঃপূর্ব্বেই কালের গর্ভে বিলীন হইয়াছিল। কালের দশন তাহাকে চর্ব্বণ করিয়াই পরিতৃপ্ত হয় নাই। তাই কিয়দ্দিন মধ্যে তারকেশ্বরের সকল সমুন্নতির মূল, সকল শ্রীসৌষ্ঠবের একমাত্র কারণ, রাজা ভারামল্লের চরমকাল সমাগত হইল। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাজা বিষ্ণুদাস ইতঃপূর্ব্বেই ইহজগৎ হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছিলেন, এক্ষণে মহারাজ ভারামল্ল ও সেই দশায় উপনীত হইলেন। তিনি বড় বিবেকী লোক ছিলেন। ভারমল্ল স্বীয় চরমকাল নিকটবর্ত্তী বুঝিয়া তারকেশ্বরের সমুদায় ব্যবস্থা ঠিক করিয়া ফেলিলেন এবং যাবতীয় তত্ত্বাবধান ও কর্তৃত্ব-ভার মোহান্ত জগন্নাথ গিরির উপর নির্ভর করিলেন; সেই মর্ম্মে একখানি উইল পত্রও সর্ব্বসমক্ষে স্বহস্তে লিখিয়াদিতে বিরত হইলেন না। আপনাদিগের প্রদত্ত বিষয় সম্পত্তি ইতঃপূর্ব্বেই দেবোত্তর করিয়া দান বিক্রয়ের কবল হইতে রক্ষা করিবার পথ করিয়াছিলেন * এক্ষণে বক্রী জমীজায়গাও দেবসম্পত্তি রূপে ব্যবস্থাপিত করিয়া স্বীয় দানশীলতা ও দেবনিষ্ঠার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিলেন। কয়েক দিন মাত্র পীড়া ভোগের পরই মহারাজ ভারামল্লের জীবনলীলা সাঙ্গ হইল। তিনি কুমার

---

* রাজা বিষ্ণুদাস নবাব সরকার হইতে যে ৫০০ বিঘা জমি দান পাইয়াছিলেন তাহার পরিমাণ বর্ত্তমান সময়ে ১৫০০ বিঘা, ইহাই তারকেশ্বরের আদি সম্পত্তি। প্রসিদ্ধ ইংরাজী এক্সেস্‌ পত্রিকা বলেন, এই সম্পত্তি তারকেশ্বর হইতে ৮ মাইল দূরে ছিল।"—তাদৃশ দলিল-দস্তাবিজ না থাকায় ইহা এক্ষণে ইংরাজ-সরকারে বাজেয়াপ্ত হইয়াছে।

সন্ন্যাসী থাকিলেও তাঁহার দেহ সমাধিস্থ করা হইয়াছিল বলিয়া কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। রাজা আজীবন দারপরিগ্রহ করেন নাই সুতরাং তাঁহার সঙ্গেসঙ্গেই তদীয় বংশ লোপ পাইল। তাঁহার অগ্রজ রাজা বিষ্ণুদাসের দুই স্ত্রী ছিলেন, তন্মধ্যে এক স্ত্রীর সন্তান হইতে তদীয় বংশ বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত অবিচ্ছিন্ন ভাবে চলিয়া আসিয়াছে। বিষ্ণুদাসের পিতা কেশব হাজারী হইতে আরম্ভ করিয়া অনুসন্ধান করিলে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত নিম্নলিখিতরূপ বংশতালিকা পাওয়া যায়।—



রাজা কেশবহাজারী হইতে, বালিগড়ি পরগণার শাসন ভার তদীয় সন্তান সন্ততিগণের উপর ন্যস্ত ছিল। তদীয় ৪র্থ বংশধর বা বৃদ্ধপ্রপৌত্র রঘুনাথ সিংহ যখন বালক তখন সেই রাজ্যরক্ষণ-ভার তাঁহার হস্ত হইতে অপহৃত হয়। যে বর্দ্ধমান রাজবংশ একবার রাজা বিষ্ণুদাসের নিকট হইতে যাবতীয় সম্পত্তি গ্রহণের প্রয়াস পাইয়াছিলেন সেই বংশীয় কোন নরপতি কর্ত্তৃকই আবার সেই প্রতিপক্ষতা আচরিত হইল। পূর্ব্ব বারে রাজা বিষ্ণুদাস নবাব সরকারে স্বীয় নির্দ্দোষীতার জ্বলন্ত প্রমাণ প্রদর্শন করিয়া বাজেয়াপ্তী বিষয় সম্পত্তির উদ্ধার করিয়াছিলেন।

রাজা রঘুনাথসিংহ সামর্থ্য ও অবস্থার অযোগ্যতায় আর পূর্ব্বপুরুষীয় পন্থার অনুসরণ করিতে পারিলেন না। কাজেই জায়গীর প্রাপ্ত তদীয় যাবতীয় পৈতৃকসম্পত্তি পরকর-কবলিত হইয়া গেল।—

রাজা বিষ্ণুদাস কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কেবল জমীজায়গা লাভ করিয়াই গৃহে ফিরিয়া আসেন নাই; বংশপরম্পরায় বালিগড়ি ও মহেনাবাগ পরগণার শাসনভারও নবাব সরকার হইতে একচেটিয়া করিয়া লইয়াছিলেন। তদীয় পৌত্র 'জগৎনারায়ণ পর্য্যন্ত এই অধিকার অব্যাহত ছিল। রঘুনাথ সিংহের বাল্যাবস্থায় জমীজায়গার সহিত সে শাসন-ভারও অপহৃত হয়!

বিষ্ণুদাসের কঠিনপরীক্ষা ও স্থানান্তরবাসের কারণ।

মহারাজ বিষ্ণুদাস যে কঠিন পরীক্ষার ফলে রাজ-সম্মানে সম্মানিত হইয়াছিলেন, সে পরীক্ষা প্রণালীর কথা স্মরণ করিলেও হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। সংক্ষেপে তাহা বর্ণনা করা যাইতেছে।—এই পরীক্ষার পর হইতেই তিনি তারকেশ্বরে মধ্যম ভ্রাতা ভারামল্লকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া বর্ত্তমান দ্বারহাটার নিকটবর্ত্তী বাহিরগড় নামক স্থানে বসবাস আরম্ভ করেন।

তাঁহাদিগের পিতা কেশবহাজারী দিল্লীর বাদসাহ আকবরের আজ্ঞা ক্রমে উত্তর পশ্চিম প্রদেশ হইতে রহনা হইয়া বঙ্গদেশে আগমন করেন এবং অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজা জমীদারকে বশ্যতাপন্ন করিয়া অবশেষে (হুগলীর) বর্ত্তমান জঙ্গী পাড়া কৃষ্ণনগরের নিকট উপস্থিত হন! ইহা পূর্ব্বে একবার সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। সেই সময়ে এইস্থানে একজন মালাকর জাতীয় প্রবল প্রতাপান্বিত জমিদার বাস করিতেন; তাঁহার হস্তে বালিগড়ি পরগণা ও ময়নাবাগ পরগণার শাসন ভার ন্যস্ত ছিল। *

কেশবহাজারী আসিয়া সর্ব্বাগ্রে ইঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। + ফলে মালাকররাজপরাজিত হইয়েন ও কেশব সিংহের বশ্যতা স্বীকার

* ময়নাবাগকে একটু সাধু ভাষায় মহেনাবাগ বলিত। এই মহেনাবাগ মদনবাগের অপভ্রংশ। অনুমান করা যায় কৃষ্ণনগরের নিকট প্রাগুক্ত মালাকররাজার রাজধানী ছিল, রাজবাটী একটী পুষ্প কানন মধ্যে অবস্থিত ছিল, এই বাগিচার নাম ছিল "মদন বাগ"। এই বাগানের নামানুসারে রাজার নাম অনুমান করিয়া লওয়া অসম্ভব নহে। সুতরাং মনে হয় এই রাজার নাম ছিল মদন মালাকার। মালী রাজার রাজপুরী ময়নাবাগ বা মহেনাবাগের নামানুসারে সমুদায় পরগণার নাম হইয়াছিল "মহেনাবাগ"।

করেন। শরণাগতকে নিরুপদ্রব রাখা বীরপুরুষের অবশ্য কর্ত্তব্য। কেশবসিংহ মালী রাজাকে পরাভূত করিয়া পুনর্ব্বার তাঁহাকে স্ব-কর্ত্তৃত্বে উপস্থাপিত করিলেন। এবং তদীয় বিষয় সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়া লইলেন। মালীরাজা ইহাতে মনে মনে যথেষ্ট ক্রুদ্ধ হইয়া রহিলেন। কিন্তু তিনি জানিতেন কেশবসিংহের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলে নিস্তার নাই। সুতরাং তদীয় প্রজ্বলিত ক্রোধাগ্নি প্রধূমায়িত হইতে লাগিল। যেমন কেশবহাজারী ইহজগৎ হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিলেন, অমনই সেই মালাকররাজা মুর্শিদাবাদের নবাব-সমীপে গিয়া জ্ঞাত করাইলেন যে—উত্তর দেশ হইতে একদল দস্যু আসিয়া নিম্ন বঙ্গকে বড় ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে! নবাব সরকার হইতে ইহার প্রতীকারের ব্যবস্থা করা হউক।

যে অবিবেকীতার দোষে মুসলমান নরপতিগণ পথের কাঙ্গাল হইয়াছিলেন; মুর্শিদাবাদের তদানীন্তন নবাব-প্রবরে সেই বিবেচনার অভাব পূর্ণ মূর্ত্তিতে বিরাজিত ছিল। নবাব বাহাদুর মালাকররাজের বাক্য শুনিয়া একবারও ভাবিবার অবসর পাইলেননা যে সে যাহা বলিতেছে তাহা ঠিক নহে; এবং যে ক্ষত্রিয়বীর পুত্র-পরিজনসহ আসিয়া অভিযোক্তামালীরাজাকে বশ্যতা স্বীকার করাইয়াছেন, তিনি প্রকৃতপক্ষে দস্যুদলপতি ছিলেন না!

যাহা হউক অবিলম্বে নবাব সাহেব একজন মুসলমান সেনাপতিকে সৈন্যদলসহ মহেনাবাগ পরগণায় পাঠাইলেন। বলদৃপ্ত মুসলমান ধরাকে সরা জ্ঞান করিল, এবং অবিলম্বে বিষণ গড় অর্থাৎ যেস্থানে কেশবহাজারী বসতি-বাটী নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন সেই স্থানে আসিয়া রাজা বিষ্ণুদাসকে আক্রমণ করিয়া বন্দী করিলেন! তারামল্ল এই সময়ে রামনগরে! তদীয় প্রধানমল্ল-রাম ক্ষত্রিয় ও তাঁহার নিকটে ছিল না। বিষ্ণুদাস এ বিপদের সূচনা পূর্ব্বে জানিতে পারেন নাই। সুতরাং মুসলমান সেনাপতি আসিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া বিনা বাধায় বন্দী করিয়া মুর্শিদাবাদে লইয়া গেল। কাজীর বিচারে তথায় তাঁহার কারাবাসের আদেশ হইল। নিরপরাধ ক্ষত্রিয় সন্তান অবনত মস্তকে তাহাতেই প্রস্তুত। অনন্তর তিনি ম্লেচ্ছের অধিনে কারাগারে থাকিয়া ম্লেচ্ছদত্ত আহার্য্য ভক্ষণ করা অতীব অকর্ত্তব্য বিবেচনা করিলেন। একদিন দুইদিন তিনদিন যাইল; তখনও বিষ্ণুদাস অনশনব্রত ত্যাগ

+ পশ্চিমদেশ হইতে আসিয়াছে বলিলে পাছে বাদসাহের লোক বলিয়া সন্দেহ হয় এই জন্যই উত্তর প্রদেশাগত বলিয়া কথিত হয়।

করিলেন না। জেলের অধ্যক্ষ অবিলম্বে এ সংবাদ নবাবের কর্ণগোচর করিল। নবাব বিষ্ণুদাসকে তদীয় সমক্ষে উপস্থিত করাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—তোমার গলায় কি?

বিষ্ণুদাস।—জাঁহাপনা! ইষ্টদেব; শালগ্রাম শিলা।

নবাব।—কেন ঐ প্রকারে উহাকে বহন করিতেছ।

বিষ্ণুদাস। ইনি আমার সঙ্গেরসাথী; পরমারাধ্য দেবতা!

নবাব।—ভাল! আহার কর নাই কেন?

বিষ্ণুদাস।—আমার শালগ্রামের ভোগ না হইলে আমি আহার করিতে পারি না! যে ম্লেচ্ছের সংস্রবে আশা করা অসঙ্গত।

নবাব।—আমরা ম্লেচ্ছ! তোমরা কি?

বিষ্ণুদাস।—আমারা আর্য্য!!

নবাব।—ভাল তোমার নির্দ্দোষীতা প্রমাণ না হইলে তুমিত ছাড় পাইবেনা; তবে কেমন করিয়া তুমি ও তোমার ঠাকুর বাঁচিয়া থাকিবে।

বিষ্ণুদাস।—আমার ঠাকুর মরিবার নহে। তবে আমি অনাহারে জীবন বিসর্জ্জন দিতে পারি বটে!

নবাব।—আচ্ছা তোমার নির্দ্দোষীতার অর্থাৎ তুমি যে বর্ত্তমান দস্যুদলপতি নও তাহার কোন প্রমাণ দিতে পার?

বিষ্ণুদাস।—কঠিন পরীক্ষা দ্বারা তাহা নির্ণয় করিতে পারেন।

নবাব ইহাতে সম্মত হইলেন। উত্তপ্ত রক্তাভ লৌহ সাবল তাঁহার দুই হস্তে প্রদত্ত হইল, তিনি তাহা সবলে ধারণ করিয়া অবলীলাক্রমে দণ্ডায়মান রহিলেন এবং "শঙ্কর শঙ্কর" শব্দে বারংবার দিগ্‌বিদিক প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিলেন।

নবাব এই অলৌকিক ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং তাঁহার নির্দ্দোষীতায় বিশ্বস্ত হইয়া "রাজা" উপাধি ও বহুশত (বর্ত্তমান ১৫০০) বিঘা জমী জায়গীর দান করিলেন! অতঃপর বিষ্ণুদাস স্বদলবল সহ স্বভবনে ফিরিয়া আসিয়া প্রাগুক্ত মালাকররাজার যথাসর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইলেন এবং অবিলম্বে তাঁহার বাসভবন, বাগান ও গড়খাঁই বেষ্টন করিয়া আর একটী পরিখা খনন করাইলেন, বর্ত্তমান সময়ে ইহারই নাম বাহির গড়। রাজা

বিষ্ণুদাস এইখানে সমস্ত জীবন যাপন করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার বংশধরগণ এখনও এখানে বর্ত্তমান আছেন। তবে সে বাটী ও সে গড় আর নাই ॥

সম্পত্তি-সংহার ।

কেশবহাজারীর ভুজবলে অধিকৃত এবং বিষ্ণুদাসের অলৌকিক পরীক্ষায় উপার্জ্জিত ভূসম্পত্তি কেন অপহৃত হয়? বিজীগীষুনরপতিগণ এ প্রতিকূলতার অনুষ্ঠান কেন করিয়াছিলেন? এ সকল কথা অনেকেরই জানিবার আকাঙ্ক্ষা হইতে পারে। এতদুত্তরে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে বর্দ্ধমান রাজসরকারের পক্ষ হইতেই এই সকল ভূসম্পত্তি হরণের ব্যবস্থা হইয়াছিল। পূর্ব্ব হইতেই এই নৃপতিবংশ বিদেশীয় বণিকগণের দ্বারা এইরূপ প্রতিপক্ষতা করিবার জন্য প্রণোদিত হইতেছিলেন কিন্তু বড় কিছু করিয়া উঠিতে পারেন নাই। কারণ বিষ্ণুদাসের পুত্র পৌত্র কেহই অকর্ম্মণ্য বা অসার ছিলেন না। রঘুনাথ সিংহকে বালক পাইয়া পরপক্ষ তাঁহাকে পথের ভিখারী করিয়া ছাড়িল। বর্দ্ধমান রাজবংশের এতদৃশ একটা অঘটন ঘটাইবার ক্ষমতা পূর্ব্ব হইতেই প্রথিত ছিল। এই বংশের প্রাক্তন ইতিহাস সম্বন্ধে জনশ্রুতি আছে এই যে—এতদ্বংশের আদিপুরুষ পশ্চিম প্রদেশাগত ক্ষত্রিয় ব্যবসাদার ছিলেন, বর্দ্ধমানে তাঁহাদের ব্যবসায়ের কেন্দ্র ছিল। সেই সময়ে ভারতে মোগলগণ অমিতবিক্রমে রাজত্ব করিতেছিলেন আর ঠিক এই সময়েই বঙ্গদেশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হিন্দু মুসলমাননরপতির উপদ্রব অত্যাচার ক্রমশঃ প্রবল হইয়া উঠিতেছিল। মোগল সম্রাট সেই সকল অত্যা-চার নিবারণের জন্য একজন মনসুবদারকে বাঙ্গালায় প্রেরণ করেন, দুঃখের বিষয় এইব্যক্তি দেশীয় ক্ষুদ্র নরপতিদিগের নিকট বারংবার পরাজিত হয়।

এবং অর্থাভাব বশতঃ সৈন্যসামন্তের উদরান্নের সংস্থান করিতেও অসমর্থ হইয়া পড়ে। মুর্শিদাবাদের নবাব এই সময়ে এরূপ হীনাবস্থ হইয়া পড়িয়া-ছিলেন, যে, আশানুরূপ অর্থ সাহায্য করিতে পারিলেননা, সুতরাং পাদশাহ প্রেরিত সেই সৈন্যাধ্যক্ষ বর্দ্ধমানের প্রাগুক্ত ব্যবসায়ীদিগের নিকট টাকা ঋণের প্রস্তাব করিলেন। ব্যবসায়ীদ্বয় তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন, সেই টাকা না পাইলে সৈন্যগণকে হয়ত সে ক্ষেত্রে অনশনে প্রাণত্যাগ করিতে হইত। ইহাই বর্দ্ধমান রাজবংশের সৌভাগ্য সবিতার উদয়গিরি। *

* আবুরায় ও বাবুরায় নামক ভ্রাতৃদ্বয় এই ব্যবসা করিতেন। বোধ হয় সংরক্ষির ব্যবসা ব্যপদেশেই তাঁহারা বর্দ্ধমানে অবস্থান করিতেন।

মোহান্তগণ ও তারকেশ্বরসম্পত্তি।

শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত দশমঠের * অন্তর্গত সন্ন্যাসীগণ তারকেশ্বর মঠের মোহান্ত হইয়া থাকেন। তাঁহারা শিবশম্ভূ তারকনাথবাপার জ্যেষ্ঠপুত্ররূপে সমুদায় সম্পত্তির রক্ষক। সুতরাং বুঝিতে পারা যাইতেছে স্ব স্ব শরীর রক্ষোপযোগী ভরণপোষণ মাত্র তাঁহারা দেবভাণ্ডার হইতে গ্রহণ করিতে পারেন। কোন সম্পত্তি নষ্ট করিবার ক্ষমতা তাঁহাদের নাই। এ পর্য্যন্ত ১৪ জন মোহান্ত তারকেশ্বর মঠে কর্ত্তৃত্ব করিয়াছেন—

১ম—মুকুন্দলাল ঘোষ (গিরি)। ২য়—জগন্নাথ গিরি। + ৩য়—কমল-লোচন গিরি †। ৪র্থ—শম্ভুচন্দ্র গিরি। ৫ম—গোপালচন্দ্র গিরি। ৬ষ্ঠ—রাধাকান্ত গিরি। ৭ম—গঙ্গাধর গিরি। ৮ম—প্রসাদগিরি ‡। ৯ম—পরশু-রাম গিরি। ১০ম—মোহনচন্দ্র গিরি। ১১শ—রঘুচন্দ্র গিরি §। ১২শ—মাধবচন্দ্র গিরি। ১৩শ—শ্যামচাঁদ গিরি ||। ১৪শ—শ্রীসতীশচন্দ্র গিরি।

মাধবগিরির চেলাগণ।

(১) শ্যামচাঁদগিরি (২) কেশবগিরি (৩) উমেশগিরি (৪) সুরেশ (৫) শ্রীশ (৬) সতীশ। শ্রীযুক্ত সতীশগিরি মহাশয় স্বীয় গুণে গবর্ণমেণ্টের প্রিয়পাত্র হইয়া মহারাজ উপাধিলাভ করিয়াছেন।

*শঙ্করাচার্য্য প্রবর্ত্তিত দশমঠের অন্তর্গত সন্ন্যাসীগণের নিম্নলিখিত দশ উপাধি হইয়া থাকে—

(১) গিরি (২) পুরি (৩) ভারতি (৪) বন (৫) জ্যোতিঃ (৬) অরণ্য (৭) পর্ব্বত (৮) সাগর (৯) তিরত (১০) সরস্বতী।

+ মুকুন্দগিরি ও জগন্নাথগিরি সম্বন্ধে প্রথমে অনেক কথা বলা হইয়াছে। জগন্নাথগিরি মাত্র ১২ বৎসর তারকেশ্বর মঠের গদিতে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

† জগন্নাথগিরি দুই শিষ্য ছিল—১ম ফতেগিরি ২য় কমললোচনগিরি। কমললোচনই মোহান্ত হয়েন।

‡ গঙ্গাধরগিরির কোন চেলা ছিল না। সুতরাং তাঁহার দেহত্যাগের পর প্রসাদগিরি নামক অন্য একজন সন্ন্যাসী গদিতে বসেন।

§ ইহার সময়ে তারকেশ্বরের শ্রীবৃদ্ধি অনেক বর্দ্ধিত হয়। ইনিই ভারামল্লের খনিত দুধ-পুকুরকে সুপ্রশস্ত ও গভীর করাইয়াছিলেন।

|| মাধবগিরি পরস্ত্রী হরণাপরাধে কারাগারে যাইলে কিছু দিনের জন্য শ্যামচাঁদ তারকেশ্বর মঠে অধিষ্ঠিত হয়েন। অবশেষে তিনি কারামুক্ত হইয়া পূর্ব্ব পদ প্রার্থনা করিলে শ্যামচাঁদ তাহা দিতে চাহেন নাই। অবশেষে বহু হাঙ্গামায় তাহা প্রদত্ত হয়। মাধবগিরির কারাবাসকালে

তারকেশ্বর তীর্থাবিষ্কারের অব্যবহিত পরে ফ্রান্সদেশীয় পণ্ডিত মুসোঁ লাদাঁত সাহেব ভারতভ্রমণে আসিয়াছিলেন। তখন শ্রীরামপুর ফ্রেঞ্চদিগের বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র ছিল। লাদাঁত সেই স্থান হইতেই তারকেশ্বর ধামে গমন করেন। ভারতবর্ষ হইতে তিনি ফ্রান্সে গিয়া ফরাসীভাষায় ভারতভ্রমণ সম্বন্ধীয় একখানি পুস্তক লিখিয়াছিলেন। তাহার একস্থানে লিখিত আছে।—

"আমি বহুকষ্টে শিরামপোরা (শ্রীরামপুর) হইতে অনেকগ্রাম ও ক্ষুদ্র নগর অতিক্রম করিয়া একজন আসলাম ভৃত্য ও একজন হেন্দুপনদিৎ এবং একজন দ্বিভাষাজ্ঞ ব্যক্তিকে সঙ্গে লইয়া হেন্দুদের পবিত্র তারকেশ্বর স্থানে উপস্থিত হইবা বন ও ময়দান ভেদ করিয়া পুনরায় ক্ষুদ্র বনের ভিতর গিয়া দেখিলাম মন্দিরে ও ইহার পার্শ্বে অনেক ব্রহ্মচারী যতি যোগী সন্ন্যাসী বর্ত্তমান রহিয়াছে। বহুযাত্রী নানা রকমে ও নানা অবস্থায় তথায় অবস্থান করিতেছিল। এই স্থানে জলকষ্ট আছে। ভোজনের বন্দোবস্ত নাই। বাজার ছিল না এবং লোকালয়ের সংখ্যা খুব কম। পথিমধ্যে কয়েকজন হিন্দু বণিক ও ধনবান কায়স্থ জমীদারের বাটিতে * একরাত্রি ও এক দিন যাপন করিয়াছিলাম। তারকেশ্বরকে হিন্দুরা খুব ভক্তি করে, এবং অনেকের মুখে শুনিয়াছি—এখানে অনেক অলৌকিক ক্রিয়া সম্পাদিত হইয়া থাকে। আমি শিবাকে মন্দির হইতে দূরে দাঁড়াইয়া দেখিয়াছিলাম। আমার মুসলমান চাকরকে আদৌ যাইতে দেয় নাই। সাথী পণ্ডিত মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। কেহ আপত্তি করে নাই।

ঢাকা মঠের অধ্যক্ষ কালীচরণগিরি আপনাকে তারকেশ্বর মঠের অধিকারী বলিয়া হুগলী জজ আদালতে নালিশ করেন। কিন্তু শেষে পরাজিত হয়েন। এই সময়ে তারকেশ্বর সংক্রান্ত অনেক প্রাচীন কাগজপত্র দাখিল করা হইয়াছিল সুতরাং বুঝা যাইতেছে মাধবগিরির কারাবাস কালে তারকেশ্বরের অনেক কাগজপত্র নষ্ট হইয়াছে।

*তৎকালে হুগলীর হরিপাল গ্রামে হরিপাল রাজার ঐশ্বর্য্যলক্ষ্মী বিরাজমান ছিল। বোধ হয় লাদাঁৎ সাহেব তাহাকেই হিন্দুবণিক নামে উল্লিখিত করিয়াছেন। হরিপাল রাজা প্রথমে মুদী ছিলেন। তাহার পর অতুল ধনসঞ্চয় করিয়া রাজসম্মানে সম্মানিত হয়েন। তিনি স্বীয় গ্রামকে ৩৪ পটীতে বিভক্ত করিয়া এক এক স্থানের কার্য্য বিশেষে এক একটী নাম দিয়াছিলেন। তাহাদের মধ্যে অনেকগুলি এখন বিলুপ্ত।

বৈদ্যপুরের সেন মহাশয়দিগের পূর্ব্বপুরুষগণ এই কায়স্থ জমীদার। কেহ কেহ বলেন তাহা নহে দশঘরার বিশ্বাস বাবুরাই উপরোক্ত কায়স্থ জমীদার।

৺ তারকেশ্বরদেবের অলঙ্কার ও মূল্যবান গৃহসামগ্রী।

সোণার।——

পাথর বসান চূড়া=১টি। গোলাপঝাড়=১টি। বিল্বপত্র=৩টি। মোহন বাঁশী=১টি। ত্রিশূল=১টি। পদ্মকুঁড়ি=একত্রে ২টি। অর্দ্ধচন্দ্র=৩টি। গোটহার ১ ছড়া। রুদ্রাক্ষ (বড়) ১টা। মটরমালা=১ ছড়া। মোহরমালা=১ ছড়া। পদক=১টা। মরিচমালা=১ ছড়া। হিরাবসান অর্দ্ধচন্দ্র=১টা। ডায়মণ্ডকাটা মটরমালা=১ ছড়া। ডায়মণ্ড কাটা অর্দ্ধচন্দ্র=১টা।

সমুদায়=২৩খানা স্বর্ণালঙ্কার।

রূপার।—

পঞ্চমুখ=১টা। রূপার খড়ম=১ জোড়া।

দুর্গোৎসবের সময়ে অলঙ্কৃত করিবার জন্য আরও কয়েকখানি অতিরিক্ত গহনা আছে। যথা—

সোণার।—

ছাতার ডাটি ও চূড়া=১টা। সর্পের মুখ=১। বড় মটরমালা (মায় থামি ১টি)=১ শত গণ্ডা। ছোট মটরমালা=২ নাল=৩ ছড়া। ধনেরমালা (মায় থামি ২ নাল=২ ছড়া।

রূপার।—

সর্প (কাঁপা)=২। ফটিকমালা=১। দক্ষিণাবর্ত্ত শঙ্খ=১টা ইত্যাদি।

অন্যান্য মূল্যবান সামগ্রী।

রূপার।—

ঘণ্টা ১। পঞ্চপ্রদীপ ১ দফা। পুষ্পপাত্র=১। শাঁখ বসাইবার ত্রিপদিকা রূপার বাঁধান চামর। কোষাকুশি=১ দফা। সিংহাসন=১ দফা। ডেক=১টা। রূপার গাড়ু=১। রূপার গড়গড়া শটকা মায় সোণার কলিকা=১ দফা। গড়গড়া বসাইবার রেকাব=১। থালা (ভোগের জন্য)=২। ডাবর=১। গেলাস=১। চন্দনের বাটি=২। রূপার তেপায়ার উপর ডিবা বসাইবার রেকাব=১দঃ। রূপার দুধ দিবার বাটী ৪টা। রেকাব=৪খানা। খাট=১ দফা।

সোণার। গেলাস—১। কলিকা—১। চন্দন দিবার বাটী—১। সোণা বাঁধান চামর ১। ডিবা (ছোট)=৫টা। ছানা দিবার রেকাব—১। ক্ষীর দিবার বাটি—১।

দুর্গোৎসবের সময়ে পূজার জন্য আরও কতকগুলি গৃহসামগ্রীর পৃথক ব্যবস্থা আছে। যথা—

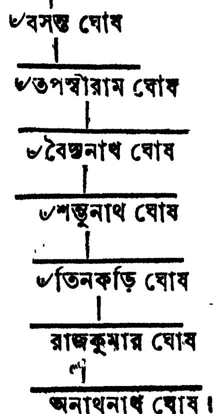
(সোণার) থাল (৩টি খুরাযুক্ত)=১। রেকাব=১। গেলাস মায় সরপোষ—১। ঘটী—১ (মায় সরপোষ। পঞ্চপ্রদীপ=১ (মায় থাল)।

(রূপার) তেপায়া (শঙ্খঘণ্টা)=১। পুষ্পপাত্র=২। ঘড়া=১। পানের ডীপে ৬দ গাড়ু=২। সামাদান=২। বড় বাটি১। কিরকিচ টাট=১। প্রদীপ।

৺মুকুন্দরাম ঘোষের বংশপত্রিকা

(পূর্ব্বে মুকুন্দ ঘোষ সম্বন্ধীয় অনেক কথার উল্লেখ করা গিয়াছে।)

৺মুকুন্দ ঘোষ



উপরোক্ত ব্যক্তিগণ বংশানুক্রমে ৺ তারকেশ্বরধামের চৈত্রমাসের খাস শিব-সন্ন্যাসে মূলসন্ন্যাসী হইয়া আসিতেছে ও মুকুন্দ ঘোষ লিখিত তারকনাথের স্তববন্দনাদি তারকনাথদেবের সম্মুখে পড়িয়া থাকে।

তারকেশ্বরের বর্ত্তমান অবস্থা।

বঙ্গের প্রসিদ্ধতীর্থ তারকেশ্বর ধাম হুগলীজেলা, শ্রীরামপুর মহকুমা ও বালিগড়ি পরগণার এলেকাধীন। ভারতনগরী কলিকাতা হইতে ইহার দূরত্ব প্রায় ৩৬ মাইল বা ১৮ ক্রোশ হইবে। এবং ঐ মহানগরীর প্রায় উত্তর পশ্চিম কোণে ইহা অবস্থিত। বর্ত্তমান তারকশ্বরধামের পরিমাণ ফল দৈর্ঘ্যে প্রায় ১॥ দেড় মাইল এবং প্রস্থে অর্দ্ধ মাইলের অধিক হইবে না। লোকসংখ্যা ন্যূনাধিক ৫ পাঁচশত মাত্র হইবে। *

অন্যান্য তীর্থের তুলনায় তারকেশ্বরের দৈনিক জনতা কিছু বেশী। তাহার কারণ ইহা একাধারে ব্যবসা বাণিজ্য.উপায় উপার্জ্জন,ও গতিবিধির স্থান। প্রথমতঃ রেলপথে যাতায়াত করিতে হয় বলিয়া অনেককে তারকেশ্বরে আসিতে হয় এবং কার্য্যগতিকে ২।৫ দিন কাটাইয়াও যাইতে হয়। দ্বিতীয়তঃ তীর্থস্থান বলিয়া যাত্রী সমাগম বন্ধ নাই। তৃতীয়তঃ নানারূপ দোকানপ্রসার থাকায় এবং চাউল, পাট, ধান প্রভৃতি সামগ্রীর অন্যতম বাণিজ্য কেন্দ্র হওয়ায় এখাণে ক্রেতা বিক্রেতার আমদানী রপ্তানী নিয়ত চলিতেছে। চতুর্থতঃ সামান্যরূপ ইংরাজী বাঙ্গালা ও সংস্কৃতশিক্ষার সুবিধা আছে বলিয়া ছাত্র শিক্ষকগণ এখানে অবস্থান করেন এবং কেহ কেহ বা প্রত্যহ যাতায়াত করিয়া থাকেন, পঞ্চমতঃ চিকিৎসালয়, পুলিশ, পোষ্টাফিস, টেলিগ্রাফ ও তারকেশ্বরের জমীদারী সংক্রান্ত কার্য্যের জন্যও এখানে প্রাত্যহিক লোক সমাগম চলিতেছে। ইহার উপর ভিক্ষুকের আমদানী আছে, নাগাফকিরের জনতা আছে ও সাধুসন্ন্যাসীর শুভাগমন চলিতেছে।

ফল কথা তারকেশ্বর আকারে ক্ষুদ্র হইলেও—অঙ্গসৌষ্ঠবে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর না থাকিলেও এবং জলবায়ুর হিসাবে উৎকৃষ্ট না হইলেও এখানকার জন-সমাগম অনিবার্য্য হইয়া উঠিয়াছে। তারকেশ্বরের প্রধান প্রধান দ্রষ্টব্য যথা—

তারকনাথমন্দির—শিবশম্ভু তারনকনাথদেবের মন্দির তারকেশ্বরের অন্যতম দ্রষ্টব্য। ইহার উচ্চতা প্রায় ৪০ হাত এবং দীর্ঘে প্রায় ১৯ হাত আর প্রস্থে প্রায় ১৭ হাত হইবে। রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে ইহা প্রায় ১ হাজার হাত দূরে উত্তর পূর্ব্ব দিকে অবস্থিত। রাজা ভারামল্লের সময় যে ক্ষুদ্রাকার মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল

* তারকেশ্বর ধামের প্রকৃত অধিবাসী একমাত্র মোহান্ত। অবশিষ্ট সমুদয় লোক ব্যবসা বাণিজ্য বা চাকরী উপলক্ষে অবস্থিত। এই শ্রেণীর লোকের পরিমাণই প্রদত্ত হইল।

তাহারইউপর খৃষ্টীয় ১৮শশতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে বর্ত্তমানের পরিদৃশ্যমান মন্দির বর্দ্ধমান জেলার কর্জ্জণাগ্রাম নিবাসী স্বর্গীয় গোবর্দ্ধন রক্ষিতের ব্যয়ে নির্ম্মিত হইয়াছে। * খৃঃ১৯০৮ সালের mayমাসের এম্প্রেস নামক ইংরাজী মাসিকপত্রে যে লিখিত হইয়াছে—

"১৭৪৪ খৃষ্টাব্দে বর্দ্ধমান রাজ তিলকচাঁদ বাহাদুর কর্ত্তৃক এই যে সংস্কার-ক্রিয়া সমাহিত হয়,।"—অনুমান করা যায়—তাহা গোবর্দ্ধন রক্ষিতের নির্ম্মিত মন্দিরের উপর হইয়াছিল। লেপ্টেনেণ্ট কর্ণেল ডি, জি, ক্রফোর্ড যে তদীয় a brief History of the Hughli District নামক হুগলীজেলার ইতিহাস গ্রন্থে লিখিয়াছেন—The original temple having fallen into decay, the present buiding was erected by the Raja of Burdwn.

এসিদ্ধান্ত কতদূর সত্য বলিতে পারি না।—প্রথম মন্দির ভগ্ন হওয়ার সংবাদ কখন শুনা যায় নাই। তবে কোন কোন স্থলে কিছু কিছু জীর্ণ বিদীর্ণ হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। পরন্তু সেই পুরাতন মন্দির ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াও দ্বিতীয় মন্দির প্রস্তুত হয় নাই এবং সে মন্দির গোবর্দ্ধন রক্ষিত ভিন্ন বর্দ্ধমানের রাজার ব্যয়ে নির্ম্মিত বলিয়া শুনা যায় নাই। মারবাড়িগণ এই মন্দির প্রস্তুত করিয়া দিতে চাহিয়াছিলেন বটে কিন্তু মোহান্তের আপত্তিতে তাহা কার্য্যে পরিণত হইতে পারে নাই। দ্বিতীয় বারের নির্ম্মিত মন্দির বিশেষ মজবুত হইলেও ইং ১৯০০সালের ভূমিকম্পে তাহার বিশেষ ক্ষতি হয়। বর্দ্ধমানের রাজা তেজচাঁদ বাহাদুরের ব্যয়ে এইবার ইহার পুনঃসংস্কার হয়।

২য় বারের নির্ম্মিত মন্দিরই এক্ষণে বর্ত্তমান। ইহা চতুষ্কোণ গম্বুজের ন্যায়। ইহার গাত্রে অনেকগুলি মূর্ত্তি খোদিত আছে। মন্দিরের দক্ষিণে ১টী মাত্র প্রবেশদ্বার। জানালা একটীও নাই। অভ্যন্তরের পরিসর অতি অল্প। পশ্চিমে স্বনাম প্রসিদ্ধ "দুধ পুকুর"। দক্ষিণে নাটবাংলা, পূর্ব্বে মোহান্তদিগের সমাধি মন্দির ও মুকুন্দঘোষনামক তারকেশ্বরের আদ্য মোহান্তের সমাধি। উত্তরে দেবতার পাকশালা প্রভৃতি।

* ধার্ম্মিক প্রবর গোবর্দ্ধন রক্ষিত ১০৯৮ সালে বর্দ্ধমান জেলার কর্জ্জনা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন, ১১৮৭ সালে তাঁহার মৃত্যু হয়। ১৮৮৯ খৃঃ সালের অক্টোবর মাসের কলিকাতা রিভিউ পত্রেও ত এই মত সমর্থিত হইয়াছে। তাহাতে লিখিত হইয়াছে—তারকেশ্বরের ২য় মন্দির প্রায় ১৫০ বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মিত। তাহা হইলে (১৮৮৯—১৫০)=১৭৩৯ খৃষ্টাব্দের সমসাময়িক এই মন্দির।

এই প্রাচীন মন্দিরের মধ্যে ভগবান্ পার্ব্বতী বল্লভের শিলাময়া মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে, এ মূর্ত্তি হস্তপদাদি-বিশিষ্ট নহে। স্তম্ভাকৃতি মাত্র। জনপ্রবাদ এই শিলাখণ্ডের অধিকাংশ মৃৎপ্রোথিত আছে। নাতিস্থূল স্তম্ভাকৃতি যে শিলাখণ্ড মহারাজ ভারমল্লের সময় লোক-লোচনের বিষয়ীভূত ছিল, তাহা এক্ষণে দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইয়াছে অর্থাৎ সেই শিলাখণ্ডকে কোন প্রকার কঠিন জমাটে (লাক্ষাকড়ারে) সমাবৃত করা হইয়াছে, তাহাও আবার রৌপ্যাবরণীতে (ডেকে) অনবরত ঢাকা থাকে। এই আবরণী খুলিলে যে অর্দ্ধচন্দ্র দেখা যায় তাহা ঐ কঠিন জমাটের উপর স্বর্ণের দ্বারা খোদিত বলিয়া শুনা যায়।

নাট বাংলা বা নাট্যমন্দির—তারকনাথ মন্দিরের সম্মুখে দক্ষিণ দিকে উন্মুক্ত একটী সুবৃগু অট্টালিকা দেদীপ্যমান। ইহারই নাম নাটবাংলা বা নাট-মন্দির। প্রায় সহস্র বৎসর পূর্ব্বে 'মোহনগিরি' মোহান্ত এই প্রাসাদ প্রথম নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। তাহার পর হাওড়াজেলার রামকৃষ্ণপুর নিবাসী স্বর্গীয় চিন্তামণি দে নামক এক ব্যক্তি দেবতার প্রসাদে পুত্রকন্যাদি লাভ করিয়া এই অট্টালিকার অঙ্গসৌষ্ঠব পরিবর্দ্ধিত করাইয়া দেন। কথিত আছে চিন্তামণি নির্ব্বংশ হইয়া তারকনাথ দেবের শরণাপন্ন হয়েন—এবং শিবশম্ভুর স্বপ্নাপ্ত ঔষধ স্বীয় পত্নীকে ধারণ করাইয়া অতীব বৃদ্ধাবস্থায় দুইটী কন্যা ও একটী পুত্র সন্তান লাভ করেন। ইহাতে তিনি সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া তারকনাথের নাটমন্দিরের মেজে মর্ম্মর প্রস্তর দ্বারা এবং পুরীর রাস্তাগুলি পাথরে বাঁধাইয়া দেন। নাট্য-মন্দিরাদির সংস্কার আনুমানিক ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের সমসাময়িক। এই নাট মন্দিরের মধ্যে বেদির উপর শিবের ষাঁড় ও নন্দীর মূর্ত্তি এবং কয়েকটী ঘণ্টা ঝুলান আছে। নাটমন্দির—কোন প্রকার ফলকামী ব্যক্তিবর্গের হত্যা বা ধন্না দিবার এবং মোহান্ত বা সাধারণ লোকের ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান ও স্তোত্রাদি পাঠ, এমন কি সঙ্গীত চর্চ্চাদির নিমিত্তও ব্যবহৃত হয়।

রাসমন্দির—মোহান্তাবাসের নিকটে একটী উন্মুক্ত চতুর্দ্বার মন্দির পরি-লক্ষিত হয়। রাসের সময় ইহাতে শোলার ফুল দিয়া মহা ধুমধামে রাসোৎসব ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া থাকে। এতদুপলক্ষে কবি গানের স্রোত কয়েক দিন ব্যাপিয়া তারকেশ্বরধামকে উদ্বেলিত করিয়া রাখে এবং জলস্রোতের ন্যায় জনস্রোত বহিয়া থাকে।

তারকেশ্বরের ২য় দেবায়তন—কালীবাড়ী। তারকনাথ মন্দিরের পূর্ব্বাংশে কালিকা দেবীর ধাতুময়ী মূর্ত্তি এ মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত আছে। পুরুষ থাকিলেই প্রকৃতির আবশ্যক করে। বোধ করি এই কারণেই শঙ্কর-সান্নিধ্যে শঙ্করীর প্রতিষ্ঠা হইয়াছে।

৩য় দেবালয়—লক্ষ্মী নারায়ণজীর মন্দির। মোহান্তাবাসের পূর্ব্বাংশে সংলগ্ন-ভাবে ইহা অবস্থিত। ধানাধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মীদেবী ও তদীয় আরাধ্যপতি নারায়ণদেবের মূর্ত্তি এই গৃহে প্রতিষ্ঠিত আছেন। তাহা ছাড়া অনেকানেক শালগ্রাম শিলাও ইহার মধ্যে স্থান পাইয়াছে।

৪র্থ দেবালয়—দামোদর শালগ্রামের মন্দির। ইহা তারকনাথ মন্দিরের উত্তর দিকে অবস্থিত।

অন্যান্য শিবমন্দির—তারকনাথ মন্দিরের পূর্ব্বাংশে ৫টী শিবমন্দির দৃষ্ট হয়, এগুলি এক একটী মৃত মোহান্তের সমাধি। ইহাদের মধ্যে সর্ব্ব দক্ষিণাংশের ১টী মন্দিরে ২টী শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে—বলা বাহুল্য দুইটী সমাধির উপর এই শিবলিঙ্গ দ্বয়ের স্থাপনা করিয়া একই মন্দিরে আচ্ছাদিত করা হইয়াছে। এই মন্দিরের দক্ষিণাংশে যে একটী শিবমন্দির আছে তাহা মায়ীর মন্দির নামে প্রসিদ্ধ। কালীবাড়ীর মধ্যেও ২টী ছোট ও একটী বড় শিবমন্দির আছে। ইহাও সমাধি মন্দির। কালীমন্দিরের পশ্চিমাংশে ২টী সমাধিস্তম্ভ (অবরুদ্ধ ক্ষুদ্র সমাধি স্থান) আছে। তাহা হইলে তারকেশ্বরপুরীতে সর্ব্বসমেত ১১টী সমাধিস্থান পরিলক্ষিত হইতেছে।

শাখামঠ।—বঙ্গদেশের মধ্যে তারকেশ্বর ধামের মঠ বহু প্রসিদ্ধ। শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত মোহান্তগণ ইহার রক্ষক হইয়া থাকেন। চেলা বা শিষ্যপরম্পরায় এই রক্ষণ বা তত্ত্বাবধান কার্য্য অবলম্বিত হইয়া আসিতেছে। এক মোহান্তের একাধিক শিষ্য বা চেলা থাকিলে, তাঁহার বিলয়ের পর প্রধান চেলাই সেবাইত হইয়া জমীদারী বা বিষয় সম্পত্তির রক্ষক পদে প্রতিষ্ঠিত হয়েন, আবশ্যক হইলে অন্যান্য চেলাগণ শাখা মঠের রক্ষণকার্য্যে প্রেরিত হইয়া থাকেন। বঙ্গদেশের নিম্ন-লিখিত মঠগুলি তারকেশ্বর মঠের অধীন। অনুমান করা যায় এই সকল মঠ বা দেবালয়ের পরিদর্শন সংরক্ষণ বা ব্যয় বহনের অভাব হওয়ায় তাহাদিগকে তারকেশ্বর মঠের অধীন করিয়া দেওয়া হইয়াছে। 'বলা বাহুল্য তাহার ফলে ইহাদিগের দেবসেবাদি নির্ব্বিঘ্নে সমাহিত হইয়া আসিতেছে।

শাখামঠ—

১ গুমগড় (মেদিনীপুর) দেবতা-শিবশম্ভু	৫ বৈষ্ণবাটী (হুগলী)—দেবতা-কালী।
২ গড়ভবানীপুর (হাওড়া) মণিনাথ শিব	৬ চাঁইপাট— " দশভূজা দেবী
৩ গুপ্তিপাড়া (হুগলী)—"বৃন্দাবনচন্দ্র	৭ সন্তোষপুর (হুগলী)— " বিশালাক্ষী
৪ ঘুসুড়ী (হাওড়া)—" মহাকালী দেবী ও " মহাকালভৈরব	৮ আমডাঙ্গা— " করুণাময়ী কালী
	৯ বড়াশী (২৪পরগণা)—দেবতা শিব।

জলাশয়—তারকেশ্বরে প্রায় ৪।৫টী পুষ্করিণী আছে। কোন জলাশয়ের জলই ভাল নহে। এই সকল পুষ্করিণীর মধ্যে ১ দুধ পুকুর ও ২ বেলপুকুর নামক পুষ্করিণীদ্বয়ই বিশেষ প্রসিদ্ধ। প্রথমোক্ত পুষ্করিণী সর্ব্বপ্রথম রাও ভারমল্ল কর্ত্তৃক খনিত হয়। তাহার পর মোহান্ত রঘুগিরি এই পুষ্করিণীর বিস্তৃতি আরও বর্দ্ধিত করেন ও ঘাট প্রস্তুত করাইয়া দেন। অবশেষে সন ১৩০৪ সালে কলিকাতার গঙ্গাধর সেন নামক এক ব্যক্তি এই ঘাট পুনর্ব্বার বাঁধাইয়া চাঁদনী প্রস্তুত করাইয়া দেন। এই পুষ্করিণী শ্রীমন্দিরের পশ্চিম দিকে অবস্থিত। রঘুগিরীর পুষ্করিণী সংস্কার আনুমাণিক ইং ১৮৫৩ সালের সমসাময়িক। শুনা যায় এই খনন-কালে কয়েকটী অস্থিপূর্ণ পাতকুয়া বাহির হইয়াছিল। বেলপুকুর পুষ্করিণীটি খুব সম্ভব তারকেশ্বর-ভাণ্ডারের ব্যয়ে বিনির্ম্মিত। অন্যান্য জলাশয়-গুলি যে আধুনিক তাহা অনেকেই জানেন। তারকেশ্বরের পূর্ব্বাংশে একটি বৃহৎ বিল আছে। মোহান্তের বাটির দক্ষিণদিকে কুঙ্কুম নামে যে একটি পুষ্করিণী আছে; তাহার জল মাত্র পানীয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়। এই জলাশয়ে বস্ত্রাদি কাচিতে দেওয়া হয় না। ষ্টেশনের নিকট"রেল বাজারের পুকুর"নামে যে জলাশয় আছে তাহার জলও মন্দ নহে। এতদ্ব্যতীত তারকেশ্বরে ৮।১০টি কূপও আছে।

পথঘাট।—তারকেশ্বরের রাস্তাঘাট নিতান্ত মন্দ নহে। এ সকল রাস্তার অধিকাংশই দেবভাণ্ডারের ব্যয়ে নির্ম্মিত। রেল ষ্টেশন হইতে যে পথ দিয়া শ্রীমন্দিরে যাইতে হয় তাহার পরিমাণ প্রায় দশ শত হস্ত। ইহার আবার কতকাংশ (মোহান্তের বাটি হইতে মন্দির পর্য্যন্ত) প্রস্তর বাঁধান। রামকৃষ্ণপুর নিবাসী চিন্তামণিদের ব্যয়েই ইহা নির্ম্মিত। এই রাস্তার অনেকগুলি শাখা প্রশাখা বাহির হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন আর একটি কাঁচা বাঁধা রাস্তা এখান হইতে পশ্চিমে সাহাপুরের দিকে অগ্রসর হইয়াছে এবং আর একটি পূর্ব্বদিকে সুদূর বর্ত্তিনী-ভাগিরথীর তীরবর্ত্তী বৈষ্ণবাটি গ্রাম পর্য্যন্ত ধাবিত হইয়াছে। শ্রীরাম-

পুরের ভূতপূর্ব্ব ম্যাজিষ্ট্রেট রিচি সাহেব তারকেশ্বরে আসিবার সুবিধার জন্য এই রাস্তার সংস্কার করাইয়া যান। তৎপূর্ব্বে অবশ্য ইহা একটি ভগ্ন পন্থা ছিল।

গৃহাদি—তারকেশ্বর ধামের সমস্ত দেবালয়ই ইষ্টক-নির্ম্মিত। মোহান্তের বাসভবন দিব্য সুন্দর দ্বিতল অট্টালিকা। মোহান্তের বাটির পূর্ব্বাংশেই মন্দিরাকৃতির উন্মুক্ত দ্বার রাসমঞ্চ। তারকেশ্বরে প্রকৃত অধিবাসীর বাস নাই। দোকানদারের সংখ্যাইঅধিক। সকল দোকানই প্রায় মৃণ্ময়, সম্প্রতি কয়েকখানি দোকানাদির গৃহ টিন দ্বারা ও ইষ্টক দ্বারা বিনির্ম্মিত হইয়াছে। মোহান্তাবাসের অতি নিকটে সম্প্রতি একটি অতি সুন্দর হর্ম্ম্য প্রস্তুত হইয়াছে। কুঙ্কুম পুষ্করিণীর পূর্ব্বদিকে শেঠিদিগের থাকিবার জন্য তাহাদিগেরই ব্যয়ে একটি ধর্ম্মশালা নির্ম্মিত হইয়াছে।

বিদ্যালয়—তারকেশ্বর ধামে বিদ্যাশিক্ষার তাদৃশ সুবিধা নাই। একটি টোল আছে, তাহাতে স্মৃত্যাদিশাস্ত্রের কথঞ্চিৎ পাঠনা হয়। কিন্তু ইংরাজী বা বাঙ্গালা শিক্ষার তাদৃশ সুব্যবস্থা নাই। চতুষ্পাঠীর ছাত্র ও অধ্যাপক দিগের তারকনাথ ষ্টেটের সাহায্যে আহারীয় ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া থাকে।

ধর্ম্মশালা—কুঙ্কুম পুষ্করিণীর দক্ষিণদিকে নাগা অতিথিদিগের থাকিবার জন্য একটী ধর্ম্মশালা স্থাপিত আছে। সমাগত নাগা সন্ন্যাসীগণকে তারকেশ্বর ষ্টেট হইতে চাউল পয়সা ও অন্যান্য আহার্য্য দিবার ব্যবস্থা আছে। এই ধর্ম্মশালা ব্যতীত মোহান্তবাস্-সংলগ্ন গোয়াল বাটীতে একটি ভাণ্ডার আছে। সমাগত আহারার্থীগণ এই স্থানে খাইতে পায়। তারকনাথদেবের ভোগের মিষ্টান্ন দিয়া সমাগত অতিথি ব্রাহ্মণ ও সাধুসন্ন্যাসিদিগকে ভোজন করান হইয়া থাকে।

চিকিৎসালয়—অনেকগুলি ব্যবসাদার ডাক্তার এখানে চিকিৎসা ব্যবসা করিতেছেন। কিছুদিন হইল এখানে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় (বা cheritable Dispensary) খোলা হইয়াছে। তারকেশ্বর ষ্টেটের সাহায্যে ইহার ব্যয় নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। চিকিৎসালয়টী মগরা লাইনের পশ্চিমে, ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের ইঞ্জিন শেডের উত্তরাংশে অবস্থিত।

বাগানবাগিচা—তারকেশ্বরে পরম রমণীয় পুষ্পকানন অধিক দৃষ্ট হয় না। আম, জাম, কাঁটাল প্রভৃতি ফলকর বৃক্ষপূর্ণ কয়েকটী বাগান এখানে বর্ত্তমান আছে। মগরা লাইনের পূর্ব্বাংশে মোহান্ত ভবনের পশ্চিমদিকে একটি মাত্র সুন্দর পুষ্পকানন বর্ত্তমান দেখা যায়।

পশ্বাদি—তারকেশ্বরধামে দুই জাতীয় পশুর সমাদর অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। তারকনাথদেবের প্রিয় বাহন বলিয়া বহুদিন হইতে এখানে হস্তী রক্ষিত হইয়া আসিতেছে। সময় সময় মোহান্ত বা তারকনাথ জমীদারীর আমলা মহাশয়গণ ইহাতে চড়িয়া নানা স্থানে গমনাগমন করিয়া থাকেন। যাত্রীগণ পরম সমাদরে হস্তীগণকে পয়সা ও অর্ঘ্যাদি দিয়া থাকে। বলিষ্ঠ বারণ মাহুতের নিদেশানুসারে পয়সাগুলি এমন কি ভাল খাদ্য দ্রব্য হইলে, তাহাও, স্বীয় চালক মাহুতকে দিয়া অধীনতার জাজ্বল্য প্রমাণ প্রদর্শন করে। হস্তী ব্যতীত বহুসংখ্যক গাভী বলীবর্দ্দ পোষণের জন্য তারকেশ্বর সম্পত্তির ব্যয়ে বহু পরিচারক নিযুক্ত রহিয়াছে। অনেকে মানসিক করিয়া তারকনাথদেবকে গোবৎসাদি উপহার দিয়া থাকে। ইহার উপর মৃগ, মহিষ; ময়না, শুক ও পারাবতাদি পক্ষীও তারকেশ্বরে বড় স্বল্প নাই।

পুলিশ থানা—পূর্ব্বে তারকেশ্বরে একটী আউটপোষ্ট ছিল। এক্ষণে তাহা একটী প্রবল থানায় পরিণত হইয়াছে।

মিউনিসিপালিটী—কয়েকটী সাধারণ ব্যবহার্য্য পাইখানা থাকায় এবং আবর্জ্জনা পরিষ্কারের আর আলোক দানের আবশ্যকতা হওয়ায় তারকানাথ ষ্টেটের সাহায্যে এখানকার মিউনিসিপালিটীর কার্য্য সম্পন্ন হয়।

পোষ্টাফিস—তারকেশ্বরে একটী সব্ পোষ্টাফিস আছে। চুচুঁড়া পোষ্টাফিস তাহার হেড অফিস এবং শ্রীরামপুর পোষ্টাফিস তাহার হিসাব রক্ষক অফিস (Account office) অনেকগুলি ছোট ছোট ব্র্যাঞ্চ অফিস ইহার অধীনে আছে।

বাজার—তারকেশ্বর ধামে প্রত্যহ একটী বাজার বসিয়া থাকে; ইহাতে শাকসজী তরীতরকারীর যথেষ্ট আমদানী হয়। তবে সকল সামগ্রীই প্রায় অধিক মূল্যে বিক্রীত হইয়া থাকে। বাজারটী মোহান্তাবাসের সম্মুখে দুধ পুকুরের দক্ষিণে ও তারকনাথ মন্দিরের পশ্চিম দক্ষিণ কোণে অবস্থিত।

দোকানীপসারী—মুদি, মনোহারী ময়রা কাঁসারি ও সেকরা প্রভৃতি সকল প্রকারের দোকানই এখানে বর্ত্তমান। অভাব—পুস্তকের দোকানের। প্রায় সকল দোকানের সামগ্রীই কিছু মহার্ঘ্য দরে বিক্রয় হয়। অনেকগুলি বিপুল-ব্যবসায়ী মহাজনও এখানে আড়ৎ করিয়াছেন! কিন্তু তাহাদিগের ব্যবসামন্দির পুরী হইতে কিছু দূরে রেল ষ্টেসনের নিকট অবস্থিত। তারকেশ্বর দেশী চাউল ক্রয় বিক্রয়ের প্রধান স্থান, তাহা ছাড়া এখান হইতে পাটও নিতান্ত

সামান্য রপ্তানি হয় না। পূর্ব্বে যে সকল স্থান বনজঙ্গল ও শ্মশান মশানে পরিণত ছিল; তাহাই এক্ষণে ব্যবসার লীলাক্ষেত্র হইয়াছে।

রেলওয়ে—১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারি ইষ্টইণ্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানি শেওড়াফুলি ষ্টেসন হইতে তারকেশ্বর পর্য্যন্ত একটী রেলওয়ে রাস্তা খুলিয়াছেন। ইহার আয় যথেষ্ট। ট্রেণের এত সুবিধা যে প্রত্যহ কলিকাতা হইতে দুইবার আসা যাওয়া করা যায়। এই শাখা রেলের নাম তারকেশ্বর ব্র্যাঞ্চ রেলওয়ে।

ইহা ছাড়া বাঙ্গালীর যৌথকারবারে বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল রেলওয়ে নাম দিয়া আর একটি ক্ষুদ্র এখান হইতে রেল খোলা হইয়াছে। ইহা তারকেশ্বরধাম হইতে উত্তরাভিমুখে বাহির হইয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের মগরা ষ্টেসনে গিয়া পুনর্ব্বার মিশিয়াছে।

মেলা ও গাজন—প্রতিবৎসর শিবরাত্রির সময় তারকেশ্বরধামে বহুযাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে। কেহ বা ভক্তি-প্রণোদিত হইয়া, কেহ বা রং ঢং দেখিবার জন্য, আবার কেহ বা রং তামাসা ছুটাইবার জন্য এখানে শুভাগমন করিয়া থাকেন। এজন্য দুই দিবস ব্যাপী একটি মেলার আয়োজন হইয়া থাকে। রেল কোম্পানীকে স্পেসেল ট্রেণের ব্যবহার করিয়া যাত্রীপুঞ্জের আদান প্রদান করিতে হয়। এতদ্ব্যতীত সংক্রান্তি পূর্ণিমা প্রভৃতি অন্যান্য পর্ব্বোপলক্ষেও তারকেশ্বরধামে যাত্রীর আধিক্য হইয়া থাকে।

সর্ব্বাপেক্ষা যাত্রী সমাগম চৈত্রমাসেই অধিক হইয়া থাকে। নানা স্থানীয় ইতর ভদ্র (দ্বিজ ভিন্ন) এই মাসে যতি চিহ্ন সূত্রে নির্ম্মিত উত্তরীয় ধারণ করিয়া কাষায় বস্ত্র পরিয়া ইচ্ছানুসারে দুই একদিন হইতে ১ মাস পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া থাকে। এবং শিবনামকীর্ত্তনে, শঙ্কর-স্মরণে ও শিবশক্তি সেবায় সন্ন্যাসাবস্থা যাপন করে। চৈত্র সংক্রান্তির দিন এই সকল উত্তরীয় উন্মোচন করিতে হয়। তজ্জন্য তারকেশ্বরে অজস্র জনসমাগম হইয়া থাকে। বহুসংখ্যক স্পেসেল ট্রেণে রেলওয়ে কোম্পানি যাত্রীগণের আমদানী রপ্তানী করিয়া ব্যবসার পথ প্রশস্ত করেন। পুলিশ ও জাতীয় স্বেচ্ছাসেবকগণ শান্তিরক্ষা করিয়া থাকেন। পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট, ও সবডিভিসনাল অফিসার আসিয়া তত্ত্বাবধান করেন।

পরিশিষ্ট

৺ তারকনাথদেবের নিত্যপূজাদি।

১। দ্বারোদ্‌ঘাটন।—প্রায় ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে প্রতিদিন তারকনাথদেবের মন্দিরের কপাট খোলা হয়। চাবিকাটী কখন মঠাধ্যক্ষ মোহান্ত মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে থাকে, কখন বা দ্বার রক্ষক রাখিয়া থাকে। এ দ্বারপাল মোহান্তের বেতন প্রাপ্ত কর্ম্মচারী নহে! বরং ইহাকে বার্ষিক জমা দিতে হয়। কারণ এই ব্যক্তি দ্বারে দাঁড়াইয়া প্রত্যেক যাত্রীর নিকট হইতে এক একটী পয়সা আদায় করিয়া থাকে।

২। স্নান।—দ্বার খুলিবার পর তারকনাথ দেবের লিঙ্গমূর্ত্তির উপর ফুলোলতৈল মাখাইয়া গঙ্গাজল দ্বারা স্নান করান হয়। অতঃপর গামছার দ্বারা গাত্রমার্জ্জন করাইয়া দেওয়া হইলে আরত্রিক হয়।

৩। মঙ্গল আরতি।—স্নানের পর দীপ দর্পণ চামর শঙ্খ প্রভৃতি দ্বারা যথোক্ত বিধানে যে আরত্রিক হয় তাহাই মঙ্গল আরতি নামে প্রসিদ্ধ। পুরোহিত বংশের উপর এই নীরাজনার ভার অর্পিত আছে।

৪।—জলযোগ।—নীরাজনার পর ৫টা বড় ওলা বহু দুগ্ধের সহিত একত্রিত করিয়া তারকনাথ দেবের মাথায় ঢালা হয়। এই সময় দেবোদ্দেশে যে চাউলাদির (৵১৷০ পোয়া) নৈবেদ্য প্রদত্ত হয় তাহা পালা পরিচালক পুরোহিত বংশধরগণ গ্রহণ করিয়া থাকে।

৫। সাধারণের পূজা।—আচণ্ডাল ব্রাহ্মণের তারকনাথ * শিবলিঙ্গের পূজা করিবার অধিকার আছে। কিন্তু সকলকেই শিবলিঙ্গের রৌপ্যাবরণীর (ডেকের) † উপর পূজা করিতে হয়। কিয়ৎক্ষণ এই পূজা হইবার পর আর কাহাকেও ঘরে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় না।

---

* শীতকালে প্রায় ৪।৫ মাস কাল তারকনাথ বিগ্রহের উপর রৌপ্যবরণী ঢাকা থাকে। এই ডেকের উপর যে ছিদ্র আছে তাহাতে একখানি গামলা ঢাকা দিয়া তাহার উপর গামছা দিয়া ঢাকিয়া দেওয়াহয়। সুতরাং পুষ্প বিল্বপত্রাদিএই কয়মাসআরলিঙ্গের গাত্র স্পর্শকরিতে পারেনা। মোহান্তপর্য্যন্ত এই ডেকের উপর পূজা করেন। শিবচতুর্দ্দশীর দিন এই ডেক খোলা হয়। প্রায় প্রতি বৎসর এইরূপ করা হয়। শীতকালে রাত্রিতে শাল ইত্যাদির দ্বারা তারকনাথের দেহ আবৃত করা হয়।

† মধু ঘৃত কেবল অমাবস্যাতেই দেওয়া হয়।

৬। মোহান্তের পূজা।—প্রায় প্রতিদিন শিবিকাযোগে মোহান্ত মহাশয় স্বীয় বাস-বাটি হইতে পূজা করিতে পুরীতে আসিয়া থাকেন এবং স্বহস্তে পূজাদি সমাপন করিয়া – অনেকক্ষণ গদিতে (মন্দির সমীপস্থ দালানে সজ্জিত বিছানায়) বসিয়া থাকেন। মোহান্তের পূজার সামগ্রী—

আতপ তণ্ডুল—/১০	ঘৃত ও মধু—/১। (প্রত্যেকে এই পরিমাণ) *
ফলমূলাদি উপকরণ—২থালা	
মেওয়া (কিসমিস্ বেদানা ইঃ)—১থালা	পানার্থ জল—
দুগ্ধ—/।০ দশসের ওলা—১৲ টাকার	পুষ্প, বিল্বপত্র, দুপদীপ, অর্ঘ্য চন্দন পুষ্পমাল্যাদি—একত্র-কদকা।

৭। আরত্রিক।—মোহান্তের পূজার পরই আবার আরতি হয় এই সময় নানাবিধ বাদ্য হইয়া থাকে।

৮। সাধারণের পূজা।—মোহান্তের পূজার পর পুনর্ব্বার তারকনাথ শিবলিঙ্গ ডেক বা রৌপ্যাবরণীব দ্বারা আবৃত করা হয়। তদনন্তর যাত্রীসাধারণের পূজা হইতে থাকে। প্রায় মধ্যাহ্নকাল পর্য্যন্ত এই পূজার স্রোত চলিলে পুনর্ব্বার তারকনাথ দেবের মন্দির-কুট্টিম বিধৌত ও পুষ্প বিল্বপত্রাদি স্থানান্তরিত করিয়া ফেলে। তাহার পর শিবশম্ভুর রাজবেশে পূজা গ্রহণ।

৯। রাজবেশ।—এই দ্বৈকালীন সাধারণী পূজার অন্তে তারকনাথ দেবের আবরণী বা ডেক খুলিয়া ফেলা হয় এবং পুষ্পের পৃথুল (গোড়ে) মাল্য, বিল্বপত্রের কমনীয় মাল্য এবং নানাবিধ স্বর্ণলঙ্কারে † শিলামূর্ত্তিকে সুসজ্জিত করিয়া তৎপার্শ্বে নন্দী বিগ্রহকে স্বর্ণছত্র হস্তে স্থাপন করিয়া দেওয়া হয়। অনন্তর প্রায় /৫॥ সের পরিমিত আতপতণ্ডুল ও অপরাপর উপকরণ এবং উপচার দ্বারা পূজা করা হইলে ভোগের ব্যবস্থা হয়। তারকনাথ

---

* মহান্ত না পারিলে পুরোহিত বা সভাপণ্ডিত পূজা করেন।

+ আজকাল নিতান্ত নীচজাতিকে মন্দিরে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় না।

অমাবস্যা পূর্ণিমার দিন ডেক ঢাকা দিয়া তবে রাজাবেশ বা শৃঙ্গার বেশ করা হয়,আচ্ছাদিত অনাচ্ছাদিত যে অবস্থাতেই রাজাবেশ হউক না তাহা রাত্রি প্রায় ৮টা পর্য্যন্ত থাকে। তাহার পর প্রকৃত শিলামূর্ত্তিকে প্রকটিত করা হয়। ইহাই কাঙ্গাল বেশ। শীতকালে প্রায় শিবলিঙ্গ ডেক ঢাকা থাকে। তখনকার রাজবেশ তাহার উপরই হইয়া থাকে। 'অমাবস্যা পূর্ণিমাতে ডেকের উপর রূপার পঞ্চমুখ দিয়া রাজবেশ করা হয়।

মন্দিরের ভিতর এক পার্শ্বে এই নন্দিবিগ্রহ ও বাসুদেবের শিখাখণ্ড বর্ত্তমান আছে। তাহাদের পৃথক পূজা হয়। সাধারণলোকে ইহাদের পূজা করিতে পারে না।

১০। ভোগ—শিবলিঙ্গকে রাজবেশে সাজাইয়া যৎকিঞ্চিৎ পূজা দিয়া তৎপরে বিবিধ মিষ্টান্ন ভোগ দেওয়া হইয়া থাকে। ভোগের জন্য নিম্নলিখিতরূপ দ্রব্যাদির ব্যবস্থা আছে। আবশ্যকতানুসারে ইহার পরিমাণ ও প্রকার বৃদ্ধি বা হ্রাস করা হইয়া থাকে।—

লুচি—৩২ সের ময়দার	মিহিদানা—/৫ সের আন্দাজ
তরকারী—অর্দ্ধমণ আন্দাজ	রসগোল্লা—/৫ সের আন্দাজ
মাথা (সন্দেশ)—/৫ পাঁচসের আন্দাজ	হালুয়া—পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট নাই
জিলাপী—/৫ পাঁচসের আন্দাজ	অন্যান্য মিষ্টান্ন—যেমন জুটিয়া থাকে
পায়সান্ন—দুগ্ধানুসারে	চাটনী—কিছু।

১১। ভোগান্তে আরত্রিক।—ভোগান্তে পুনর্ব্বার তারকনাথদেবের নীরাজনা হইয়া থাকে। রাজবেশ করাইয়া তারকনাথ শিবের পূজাকরণ, ভোগ দেওয়া, নীরাজনা করা ইত্যাদি সকল কার্য্যই পুরোহিত বংশধরগণ করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের অসামর্থ্যে তারকেশ্বরের দ্বারপণ্ডিত (সভাপণ্ডিতকে) এই সকল কার্য্য করিতে হয়। ভোগের সময় পানার্থ-কুম্ভ-পুরিত গঙ্গাজল অর্পিত হইয়া থাকে। এবং বিবিধ মসলার দ্বারা পান সাজিয়া সোণার ডিপের মধ্যে দিয়া সেবনার্থ রূপার ত্রিপাদিকার (তেপায়া) উপর ১খানি রূপার রেকাব রাখিয়া তদুপরি স্থাপন করা হয়।

১২। শয্যায় শয়ন।—ভোগের পর তারকনাথ মন্দিরে শিল্ক গদী প্রভৃতি শয্যাপূর্ণ খাট, চেয়ার ইত্যাদি তাঁহার বিশ্রামার্থ রক্ষিত হয়, রূপার গুড়গুড়ি শটকায় তামাকু সাজিয়া সেবনার্থ নিকটে স্থাপিত হয়, এবং রূপার খড়ম, রূপার গাড়ুতে জল, ও পিচ ফেলিবার জন্য রূপার ডাবর রাখিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়।

১৩। দ্বারোদ্‌ঘাটন ও নৈশ জলযোগ—প্রায় সায়ংকালে তারকনাথ দেবের দ্বারোদ্‌ঘাটন হয়। তদনন্তর পঞ্চপ্রদীপাদির দ্বারা আরত্রিক করিয়া নৈশজলযোগ দেওয়া হয়। ইহাই শীতল নামে প্রসিদ্ধ। শীতলের সামগ্রী—

লুচি—আন্দাজ আড়াই পোয়া ময়দার। হালুয়া বা সুজী—আন্দাজ একপোয়া।

মুড়কী—আন্দাজ আড়াই পোয়া। আলু পটলাদি ভাজা—কিছু।

দুগ্ধ—আড়াই সের আন্দাজ। ক্ষীর, ছানা ইত্যাদি—কিছু কিছু।

১৪। নৈশ শয়ন।—শীতল দিয়া তারকনাথদেবের প্রকৃত লিঙ্গ মূর্ত্তি প্রকটিত করান হয়। আভরণাদি * খুলিয়া লইয়া যথাস্থানে স্থাপন করা হইয়া থাকে। ইহাই কাঙ্গালাবেশ, অতঃপর গৃহাদি পরিস্কার ও ধৌত করিয়া তামাকু সাজিয়া (দিনের বেলার মত) তাম্বুল নিকটে রাখিয়া কপাট বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। এবং তারকনাথ দেবের বিশ্রামার্থ খট্টায় শয্যাদি দেওয়া হইলে মধুর রবে নহবৎ প্রভৃতি বাজিতে থাকে।

এইরূপে কিয়ৎক্ষণ বাদ্যভাণ্ড হইয়া নৈশকৃত্য সমাপ্ত হয়, তাহার পর রাত্রি প্রভাত হইলে তারকনাথ দেবকে জাগরিত করিবার জন্য আবার মধুরস্বরে নহবৎ বাজিয়া থাকে।

প্রতিদিন এই নিয়মে তারকেশ্বর ধামের পূজার্চ্চনা হইয়া থাকে।

তারকেশ্বর-মাহাত্ম্য।

(১) বহু দিনের কথা বলিতেছি, একজন মুসলমান স্বকীয় গাভীর মঙ্গলার্থ ও দুগ্ধ বৃদ্ধির জন্য তারকনাথ দেবকে কিছু দুগ্ধ মানসিক করিয়াছিল। যথাসময়ে সে ব্যক্তি এক কলস দুগ্ধ লইয়া তারকেশ্বর ধামে উপস্থিত হইলে, মোহান্ত ও আমলাবর্গ তাহাকে ম্লেচ্ছ বলিয়া প্রত্যাখ্যান করেন। সন্তপ্ত যবন মনোদুঃখে কত কি ভাবিতে ভাবিতে, ও নিজের অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতে দিতে স্বগৃহাভি-মুখে অগ্রসর হইতে থাকে। পথিমধ্যে জনৈক ফকিরের সহিত তাহার দেখা হইল। ফকির সাহেব তাহার বিষণ্ণতার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে প্রকৃত ঘটনা প্রকাশ করিল, তখন নিজের ভিক্ষার ঝুলি হইতে একটী রূপার বাটী বাহির করিয়া ফকির ফেরৎ দুগ্ধ পানার্থ চাহিল। মুসলমান এতক্ষণ দুগ্ধ লইয়া কোথায় যাইবে,—কি করিবে, কাহাকে দিবে ইত্যাদি ভাবিয়া আকুল হইয়াছিল, এক্ষণে কতকটা নিশ্চিন্ত হইল। যাহা হউক ফকির তদীয় সমুদায় দুগ্ধ তাহার পান করিয়া তাহাকে অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত করিয়া ফেলিল এবং সেই রূপার বাটী তাহাকে দিয়া বলিল এইটী তারকেশ্বর ধামের গদিতে জমা দিয়া আইস।

---

* ৺ তারকনাথদেবের অলঙ্কার ও মূল্যবান গৃহসামগ্রীগুলির নাম স্থানান্তরে উল্লিখিত হইয়াছে।

এদিকে বাটী দেখিতে না পাওয়ায় তারকেশ্বর ধামে মহা হুলস্থুল পড়িয়া গিয়াছিল। এমন সময় মুসলমান সেই বাটী লইয়া উপস্থিত হইয়া সকল বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিল। সকলেই বুঝিল—যে ইহা সর্ব্বভূতে সমজ্ঞানী ভোলানাথেরই খেলা। শুনা যায় তারকেশ্বর মঠে এই বাটী আজ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান আছে।

(২) হুগলী জেলার বাগাণ্ডাগ্রাম নিবাসী জনৈক কায়স্থ ভদ্র সন্তানের কিছু দিন পূর্ব্বে একটী ২।৩ বৎসরের পুত্র হারাইয়া যায়। সেই হইতে তাঁহার আর কোন সন্তানাদি হয় নাই। তজ্জন্য তদীয় পত্নী পুত্র হারাইবার ৬।৭ বৎসর পরে স্বীয় দেবরকে সঙ্গে লইয়া তারকেশ্বরধামে আসিয়া পুত্রকামনায় শিব শম্ভুর সম্মুখে ধন্না দেয়। এক দিন হত্যা দিবার পর তিনি দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন যে, একটি ৮।৯ বৎসরের গৈরিক ধারী সন্ন্যাসী বালক তাঁহার নিকট আসিয়া পয়সা ভিক্ষা করিতেছে। কুল মহিলার ছেলেটাকে দেখিয়া যেন মনটা কেমন হইয়া গেল। তিনি তাহাকে কাছে বসাইয়া পয়সা দিয়া স্বীয় দেবরকে ডাকাইলেন এবং বলিলেন দেখ দেখি এ ছেলেটা ঠিক তোমার দাদার (স্ত্রীলোকটীর স্বামীর) মত কিনা। দেবর প্রবরও এই সন্দেহ করিতেছিলেন। তখন বালকের পরিচয় জিজ্ঞাসা করা হইল সে বলিল হুগলীর সন্তোষপুর মঠের মোহান্তের কাছে সে থাকে ও তাহার সোণার হেঁসো ও মাদুলী তথায় আছে। তখনই মোহান্তের নিকট স্ত্রীলোক বালককে নিজের পুত্র বলিয়া খবর দিলেন। মোহান্ত সন্তোষপুরের মোহান্তকে তলপ করিলেন। তিনি সেই মাদুলী হেঁসো আনিয়া প্রদর্শন করিলে কামিনী বেশ জানিল যে এ সামগ্রী তাঁহাদেরই এবং এই অলঙ্কার সহ তদীয় সন্তান হারাইয়াছিল। তখন রমণীকে তাহার সন্তান প্রদত্ত হইল। তিনি মহা ধুমধামে পূজা দিয়া হারানিধি কোলে লইয়া গৃহে প্রস্থান করিলেন।

৩। প্রায় ৮।১০ বৎসর পূর্ব্বে এক চক্ষুহীন ব্যক্তি চক্ষুরত্ন লাভের জন্য তারকেশ্বরধামে আসিয়া হত্যা দেয়। কলিকাতা হইতে আসিবার সময় সে একজন ভদ্রলোককে হাওড়া ষ্টেশনে টিকিট করিতে টাকা দিয়াছিল কিন্তু সে ব্যক্তি টিকিট না দিয়া টাকা লইয়া প্রস্থান করে। অন্ধ টিকিট না পাইয়া আর্ত্তনাদ করিতে আরম্ভ করায় কয়েকজন ভদ্রলোক চাঁদা করিয়া অন্ধকে একখানি টিকিট কিনিয়া দেন এইরূপে সে তারকেশ্বরে আসিয়া হত্যা দেয়। ২।৩ দিন ধন্না দিয়াও যখন তাহার প্রতি কোন প্রত্যাদেশ হইল না; তখন সে ব্যক্তি

মরিবার সঙ্কল্প করিয়া হত্যা দেওয়া পরিত্যাগ করিল। মায়া মানুষকে নেত্রাশ্রু বর্ষণে প্রণোদিত করে। অন্ধ মরিতে চলিয়াছে কিন্তু প্রাণের মমতায় সে না কাঁদিয়া থাকিতে পারিল না; সে নিকটবর্ত্তী শিবমন্দিরের দ্বারে বসিয়া বিলাপ করিয়া কাঁদিতেছে এমন সময় হঠাৎ তাহার সুন্দর দর্শনশক্তির আবির্ভাব হইল। চোখের ঘোলা কাটিয়া গেল। চক্ষুদ্বয়ও একটু বিস্ফারিত হইয়া উঠিল। অন্ধ সানন্দে বলিয়া উঠিল "পাইয়াছি আর মরিব না।'' বাবা দয়া করিয়াছেন; "দিব্যদৃষ্টি লাভ হইয়াছে।" নিকটে যাহারা দাঁড়াইয়াছিল তাহারা এই দৃশ্য দেখিয়া অবাক হইয়া গেল, এবং সে ব্যক্তিকে ভাগ্যবান্ জ্ঞান করিয়া নানা জনে নানাবিধ খাদ্য আনিয়া অর্পণ করিতে লাগিল।

৪। প্রায় ১০।১২ বৎসর হইল একটী নীচ জাতীয় স্ত্রীলোক শিরঃপীড়ায় কাতর হইয়া তারকেশ্বরে আসিয়া ধন্না দিয়াছিল কয়েক দিন হত্যা দিবার পর তাহার প্রতি প্রত্যাদেশ হইল—তুই পথিমধ্যে আমিষ খাইয়া বাটী ফিরিয়া যা, রোগ সারিবে। রোগিনী ইহাতে বেশ বিশ্বস্ত হইতে পারিল না, কিন্তু কি করে আর অনাহারে থাকিতে পারে না। কাজেই সে ১টী শোলমাছ কিনিয়া বৈদ্য-বাটির রাস্তা ধরিয়া নিজ বাটির উদ্দেশে চলিল কিয়দ্দূর গিয়া সে বাসুদেবপুরের আড্ডায় বিশ্রামার্থ বসিয়া শিয়রে মাছটী রাখিয়া ঘুমাইয়া পড়িল। কিয়ৎক্ষণ পরে দেখা গেল তাহার নাসিকা হইতে ২টী সূত্রাকার সর্প বাহির হইয়া মাছটি খাইতেছে। তখন লোকজন বিপদাশঙ্কা করিয়া তাহাকে জাগাইল। রোগিনী উঠিয়া রোগমুক্তির স্বচ্ছন্দতার সুফলানুভব করিয়া স্বগৃহাভিমুখে চলিয়া গেল। সাধারণ লোকে বেশ বুঝিল ইহা শিবসম্ভূত লীলা।

৫। কৃষ্ণপুরনিবাসী দুলে জাতীয় এক ব্যক্তি বিষম অম্লশূল রোগে সমা-ক্রান্ত হইয়া তারকেশ্বরে আসিয়া হত্যা দেয় কিন্তু ২।৪ দিনে প্রত্যাদেশ না হওয়ায় যন্ত্রণায় স্বীয় বক্ষে তারকনাথের ঘড়ী বাজাইবার মুগুর লইয়া আঘাত করিত। এজন্য তাহাতে পুরী হইতে স্থানান্তরিত করা হয়। সে তখন মোহান্তের গোয়ালবাটীর নিকট বসিয়া আর্ত্তনাদ করিতে থাকে কিন্তু দেবের এমনই কৃপা যে সেই স্থানেই ঔষধ লাভ করে। এই ব্যক্তিই এক্ষণে একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি হইয়া উঠিয়াছে। ইহার বাটীতে কৃত্রিম তারকেশ্বর দেব স্থাপিত হইয়াছে। তথায় প্লীহা ও অন্যান্য নানাবিধ রোগের ঔষধ প্রদত্ত হয়।

(৩য় পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

শঙ্করাচার্য্য প্রবর্ত্তিত দশমঠের অন্তর্গত সন্ন্যাসীগণের
কার্য্য বা প্রকার বিশেষে নিম্নলিখিত
১০ দশটী উপাধি হইয়া থাকে।

(১) গিরি (২) পুরি (৩) ভারতি (৪) বন (৫) জ্যোতিঃ।
(৬) অরণ্য (৭) পর্ব্বত (৮) সাগর (৯) তিরত (১০) সরস্বতী।

(৬৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

৺তারকনাথদেবের মন্দিরের শিরোদেশে একখানি ইষ্টকের উপর খোদিত আছে—সঃ ১৬৪৭। ইহা যে বর্ত্তমান মন্দির নির্ম্মাণের কাল তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এটী ১৫৪৭ কি ১৬৪৭ এবং সঃ টী শকাব্দার সাংকেতিক কি সংবতের সাংকেতিক? এতদুত্তরে ইহা আমরা বেশ সাহস করিয়া বলিতে পারি সঃ টী শকাব্দার সঙ্কেত। নিরক্ষর স্থপতি শঃ লিখিতে সঃ লিখিয়া বসিয়াছে। ইহা সংবতের চিহ্ন হইলে তারকেশ্বর মন্দির অনেক দিন পূর্ব্বের হইয়া পড়ে। অপিচ সংখ্যা কয়টী যে ১৬৪৭, তাহাও একান্ত স্বীকরণীয়। তাহা হইলে এই পরিদৃশ্যমান গোবর্দ্ধন রক্ষিতের বিনির্ম্মিত মন্দির (১৮৩১ শঃ—১৬৪৭ শঃ) =১৮৪ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ (১৯১০ সাল—১৮৪)=১৭২৬ খৃষ্টাব্দে এবং ১৩১৬ সাল—১৮৪)=১১৩২ সালের সমসময়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল। কলিকাতা রিভিউপত্রে এই মন্দিরকে ১৭৩৯ খৃঃ অব্দের সমসাময়িক বলা হইয়াছে। (তারকেশ্বর তথ্য ৬৬ পৃঃ ফুটনোট দেখ)।

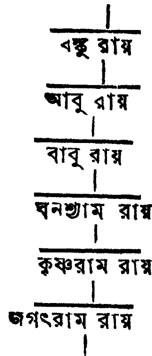
(৬৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

নাটমন্দিরের শিরোদেশে খোদিত আছে "১১৯৭ সাল অগ্রহায়ণ" ইহা যে নাট্যমন্দির নির্ম্মাণের কাল তাহা সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন। তাহা হইলে (১৩১৬—১১৯৭)=১১৯ বৎসর পূর্ব্বে নাটমন্দির প্রস্তুত হইয়াছে। এসময় মোহন গিরিমোহান্তের আমল। ইহা চিন্তামণি দের ব্যয়ে প্রস্তুত হওয়া সম্ভাবিত নহে। কারণ তদীয় নাটমন্দিরাদি-সংস্কার ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের সমসাময়িক। কেহ কেহ বলেন নাটমন্দির কলিকাতার প্রসিদ্ধ 'ছাতুবাবুর ব্যয়ে নির্ম্মিত। তাহাও অসম্ভব। কারণ ছাতুবাবুর পিতাই ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন, তাহার পুত্রের ব্যয়ে মন্দির সংস্কার ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে হওয়া অসম্ভব। তবে ছাতুবাবুর ব্যয়ে নাটমন্দির সংস্কার মাত্র হইলেও হইতে পারে।

বর্দ্ধমান রাজবংশ।

বর্দ্ধমান রাজবংশের সহিত তারকেশ্বর ধামের কিছু ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক দেখা যায়। এই জন্য তারকেশ্বর তীর্থের ইতিহাস লিখিতে বসিয়া আমাদিগকে তদ্বংশ সম্বন্ধেও দুই চার কথা বলিতে হইয়াছে। (৬০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

সঙ্গম রায় (পঞ্জাবাগত ক্ষত্রিয়)



(ক) কীর্ত্তিচন্দ্র রায় — (৭) মিত্রসেন

চিত্র সেন

তিলকচাঁদ (মিত্র সেনের পুত্র)

ঔরস পুত্র প্রতাপচাঁদ কিন্তু তাহার মৃত্যু হইলে দত্তক গৃহীত হন—মহাতাপচাঁদ

আপতাপ মহাতাপ (দত্তকপুত্র)

বিজয়চাঁদ

৺ তারকেশ্বর তীর্থের ১ম পুরোহিত স্বর্গীয় চতুর্ভুজ গঙ্গোপাধ্যায়ের বংশ।

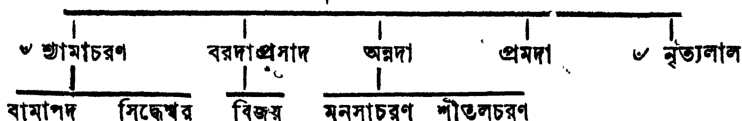
৺ চতুর্ভুজ গঙ্গোপাধ্যায় (৪৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

৺ নিমাইচরণ গঙ্গোপাধ্যায়

রামকানাই গঙ্গোপাধ্যায়

৺ রামধন গঙ্গোপাধ্যায়

৺ রাজকুমার গঙ্গোপাধ্যায়



তারকেশ্বর তথ্য।

বঙ্গের প্রসিদ্ধ তীর্থ ৺ তারকেশ্বরধামের প্রাচীন আধুনিক নানা অলৌকিক রহস্যপূর্ণ সম্পূর্ণ নূতন ইতিহাস।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাজকুমার বেদতীর্থ স্মৃতিতীর্থ কাব্যভূষণ বিরচিত।

মূল্য—ডাকমাশুল সমেত ।৵০ দশ আনা।

তারকেশ্বর তথ্য বঙ্গসাহিত্যে অভিনব পুস্তক। প্রায় শত পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ বঙ্গের প্রাচীন তীর্থ তারকেশ্বর ধামের প্রাচীন ইতিবৃত্ত ইহাতে সরল বাংলায় বিবৃত হইয়াছে। পুস্তকখানি পড়িতে বসিলে বুঝিতে পারিবেন না যে ইতিহাস পড়িতেছেন কি গল্পের বই পড়িতেছেন। ভাষা এমনই সরল ও এমনই সুন্দর। তারকেশ্বর ধাম পূর্ব্বে কিরূপ ছিল, কিরূপে কোন সময়ে কেমন করিয়া ইহার আবিষ্কার হইল, তদানীন্তন কালে নিম্ন বঙ্গেরই অবস্থা বা কিরূপ ছিল, ইত্যাদি অনেকানেক আবশ্যকীয় কথা তারকেশ্বর তথ্য পাঠে অবগত হইবেন। এক কথায় ইহা, গল্প সাহিত্য ইতিহাস উপন্যাস ও নবন্যাসের আধার। বহুকষ্টে ও বহু ব্যয়ে কাগজ পত্র সংগ্রহ করিয়া তবে এ পুস্তক লিখিত হইয়াছে। তাহার তুলনায় ইহার ।৵০ দশ আনা মূল্য কিছুই নহে। আপাততঃ ১ খণ্ড বাহির হইয়াছে। শীঘ্রই ইহার পরিশিষ্টের ২য় খণ্ড বাহির হইবে। আমরা সাহিত্যামোদী ব্যক্তিগণকে এ হেন একখানি নূতন ধরণের পুস্তকের রসাস্বাদন করিতে অনুরোধ করি। পুস্তকখানি ভাল হইয়াছে কি মন্দ হইয়াছে; আমাদের বলিতে হইবে না; দূরবর্ত্তী স্থানের সংবাদপত্র সম্পাদকগণ ইহার অংশ বিশেষ পাঠ করিয়াই কিরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন; পাঠ করুন।—

(১) তারকেশ্বর তথ্য প্রীতিপ্রদ ও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। (মানভূমপত্রিকা). (২) তারকেশ্বর তথ্য প্রসিদ্ধ তীর্থ তারকেশ্বর ধামের রহস্যময় ইতিহাস (বর্দ্ধমান সঞ্জিবনী) (৩) তারকেশ্বর তথ্য × × টীতে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় আছে (কাজের লোক) (৪) তারকেশ্বর তথ্যখানি শ্রীযুক্ত রাজকুমার বেদতীর্থ মহাশয়ের বহু অনুসন্ধিৎসার ফল। × একখানি অভিনব উপাদেয় ইতিহাস। (জগজ্জ্যোতি) (৫) তারকেশ্বর তথ্য তারকেশ্বর মহাতীর্থের নানা রহস্যময় জ্ঞাতব্য বিষয় পূর্ণ ইতিহাস × ইহাতে অনেক জানিবার ও শিখিবার বিষয় আছে প্রত্যেক হিন্দু নর নারীর ইহা পাঠ করা একান্ত কর্ত্তব্য। (চিকিৎসা প্রকাশ)

প্রাপ্তিস্থান।—শ্রীশরৎকুমার ভট্টাচার্য্য—কৈকালা, কৈকালা পোঃ (হুগলী) শ্রীযুক্ত বাবু সুরেন্দ্রনাথ বসু ২নং রামমোহন সাহা লেন, সিমলা (কলিঃ)।